শ্রীকৃষ্ণ চরিত।

কলিকাতা,—১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে

"সা-কোম্পানি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ক্রাইটিরিয়ন প্রেসে

(১ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

এবং

৬২ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, হিন্দুপ্রেসে

(১২১ হইতে ১৯০ পৃষ্ঠা)

শ্রীনীলমণি ধর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৫।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

কংসের জন্ম বিবরণ।

বসন্তকাল সমাগত। প্রকৃতি-দেবী বিচিত্র ভূষায় বিভূষিতা। ...ম রমণীয় স্বভাব-সৌন্দর্য্যে চারিদিক বিভাসিত। এই সময়ে মথুরাধিপতি উগ্রসেনের মহিষী সুযামুন পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন বাসনায় সখীগণ সমভিব্যাহারে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে কোথাও ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মৃদু-মন্দ তরঙ্গ হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা পাদপ সমূহ, নবোদগত সুচারু কিশলয় যোগে সুশোভিত হইয়া দর্শকদিগের মনপ্রাণ হরণ করিতেছে, কোথাও বা নবতৃণনিবহে সমাচ্ছন্ন ও ইন্দ্রগোপসমূহে বিভূষিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি যুবতী বণিতার ন্যায় আর্ত্তব দেহ ধারণ করিয়াছে, কোথাও বা ময়ূর ময়ূরীগণ নানা বর্ণে সমলঙ্কৃত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কেকা-রব করিতে করিতে নৃত্য ভঙ্গিমায় অপর

শুনিতে পাই।

বিহগকুলের কূজন ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা বনরাজি সমুথিত কুসুম গন্ধবহ মৃদুমন্দ লহরীলীলায় প্রবাহিত হইয়া মনের মধ্যে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির ভাব আনিয়া দিতেছে, এইরূপ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রীতিরসে আপ্লুত হইয়া সখীগণপরিবৃতা রাজমহিষী অপূর্ব্ব আরাম উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে যেন বিধাতা কর্ত্তৃক নীত হইয়াই সৌভপতি তেজস্বী দ্রামিল নামক দুর্দ্দান্ত দানব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্বীয় রথ পর্ব্বতপার্শ্বে স্থাপন করিয়া সারথির সহিত সেই গিরিশিখরে বিচরণ করিতে করিতে অদূরে সখীগণসহ ক্রীড়মানা সুরসুন্দরীসদৃশী অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী রমণী-রত্ন সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে সেইদিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে ভাব অপনীত হইয়া গেল। একেই ত ঋতু প্রভাবে স্থান মাহাত্ম্যে মনের মধ্যে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার মন্মথবোধন মলয়-মারুত-সঞ্চালিত কেশর সংস্পর্শে মনোমধ্যে কাম ভাব আবির্ভূত হইল। তখন সেই সুকুমারাঙ্গী ললনার চন্দ্রপ্রভ বদনের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ততই তাহার সম্ভোগবাসনা বর্দ্ধনশীলা হইতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ দ্রমিল আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। যে কোন উপায়েই হউক সেই অসহায়া রমণীর সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল।

তখন দানবপতি সারথিকে রথ রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া ধ্যানযোগে অবগত হইল যে, এই বনবিহারিণী বরবর্ণিনী মথুরাধিপতি উগ্রসেনের মহিষী। ইহা জানিতে পারিয়া মায়াবী দানব উগ্রসেনের মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তথায় সেই

নিঃসহায়া সরলা রমণীর সতীত্ব নাশ করিল। পরিশেষে [illegible] মায়ামূর্ত্তির কথা মহিষীর অবিদিত রহিল না; তিনি গৃহে [illegible] আসিলেন, কিন্তু ইহা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন অন্তরের জ্বালা অন্তরেই গোপনে রাখিলেন।

দৈবক্রমে উগ্রসেনের-মহিষীও সেই সময় রজস্বলা অবস্থা অবস্থিত ছিলেন, বিধাতাব নির্ব্বন্ধে সেই দানব সহবাসে রমণী গর্ভবতী হইলেন। গর্ভের বিধিব্যবস্থা সংস্কারাদি সমস্তই নিয়মমত সুসম্পাদিত হইল, কিন্তু রাণীর মনে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল তিনি যেন ক্রমশই শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন।

যথাসময়ে উগ্রসেন-মহিষী একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন, রাজ-বাটীতে আনন্দ কোলাহল উঠিল, চতুর্দ্দিকে দানক্রিয়া সমারব্ধ হইল, রাজ্য মধ্যে উৎসব আয়োজন হইতে লাগিল। মহারাজ উগ্রসেন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে নবকুমারের মুখসন্দর্শনের জন্য সূতিকাগারে সমাগত হইলেন। কিন্তু পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিবামাত্র আনন্দের পরিবর্ত্তে কেমন এক আশঙ্কা উদয় হইল। হৃদয়াকাশ কালিমা-মেঘে যেন ঢাকিয়া ফেলিল, রাজা প্রসূতিব গৃহ হইতে উদ্বিগ্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। কেন এমন হইল রাজা নিজে তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজাদেশে নানা স্থান হইতে দৈবজ্ঞগণ আহূত হইল। তাঁহারা আসিয়াও নবকুমার সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়া দিলেন তাহাতে রাজার হৃদাকাশস্থিত আশঙ্কা মেঘ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তবে বিধাতার লিপি খণ্ডিত হইবার নহে জানিয়া কতক প্রবুদ্ধ হইলেন। এ দিকে সন্তানও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু শৈশব কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই

প্রকৃতি প্রকাশ পাইল। বাল্যকালেই সঙ্গীদিগের সহিত
ার নাই, আত্মীয়জনের প্রতি মায়ামমতা নাই, বালস্বভাব-
ভ সরলতাময় মধুরিমা নাই। কেমন এক উগ্রপ্রকৃতি, কেমনই
ক কঠোব ভাব, তাহার উপর আবার স্বার্থপরতা পূর্ণমাত্রায়
বিরাজমান। এহেন দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি উগ্রসেনতনয় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত
হইয়া সাধারণের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। স্বয়ং পিতাও
এরূপ দুর্দ্দমনীয় পুত্রকে শাসনে আনিতে পারিলেন না। কাজেই
রাজকুমার উচ্ছৃঙ্খল গতি প্রাপ্ত হইল। এই উন্মার্গগামী বল-
দর্পিত রাজকুমারই কংস নামে অভিহিত।

কংসের অত্যাচার।

দানবপ্রকৃতি কংস ক্রমশঃ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া
যদু, ভোজ ও অন্ধক বংশীয়দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে
লাগিল। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদাধিপতিগণ ও বর্দ্ধিষ্ণু সামন্তবর্গ
সকলেই দুরাত্মা কংসের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইতেছে দেখিয়া
পিতা উগ্রসেন পুত্রকে সুদৃঢ় শাসনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত ফল ফলিল।

অসুরস্বভাব কংস পূর্ব্ব হইতেই প্রলম্ব, বক, চানুর, তৃণাবর্ত্ত,
অঘ, মুষ্টিক অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পুতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, ভৌম
প্রভৃতি অসুর দলপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে
পিতা উগ্রসেনকে স্বীয় স্বাধীন গতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে
দেখিয়া বলদর্পিত যুবা অসুর দলপতিদিগের সম্মিলিত সাহায্যে
াকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং মথুরার সিংহাসন

অধিরোহণ করিল। সকলে এই আকস্মিক ব্যাপার অবগ করিলেও মহাবল কংসের বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু সকলেই একাত্মমনে এহেন অত্যা কংসের পতন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বলদৃপ্ত কংসেরও দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল অনেকে তাহার নির্দারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজনৈতিক রহস্য।

প্রবল পরাক্রান্ত কংস মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যখন অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিল তখন তাহার চতুঃপার্শ্বে গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনাদি নানা জনপদ বিদ্যমান ছিল। তথাকার অধিপতিগণ মথুরারাজের করদ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিজেদের প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিতেন। গোপালন ও হল চালন তথাকার প্রজাবৃন্দের প্রধান কার্য্য ছিল। স্বয়ং ভূপতিগণও এই কার্য্য সাধনের আদর্শ স্বরূপে প্রজামণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

সেই সকল করদ নৃপতিগণ কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সেই বিষম দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি লাভের জন্য সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নানাবিধ পরামর্শের পর স্থিরীকৃত হইল যে, কংস দানব দলপতিবর্গের বলসংগ্রহ দ্বারা যেরূপ তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দৈববল ব্যতিরেকে তাহার উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই। দৈববল সংগ্রহ করিতে হইলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের আরাধনা ভিন্ন অন্য

কণ্টক সমূলে উৎপাটিত হয় তাহাহইলে তখন মথুরার শূন্য সিংহাসনে কোন্ বংশ স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য? ক্রমশঃ সেই বিষয় নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল। সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, মথুরাধিপতি উগ্রসেনের জামতা বসুদেব ধনে মানে জ্ঞানে সকলের অগ্রগণ্য, বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাব নিষ্কলঙ্ক শশীর ন্যায় পরম পবিত্র, কুলগৌরব ও সম্বন্ধ-সূত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার প্রজাপালন নীতিও সমধিক প্রশংসনীয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারই বংশধর যাহাতে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পর ভগবানের আরাধনা কল্পে সকলের সম্মিলিত সাহায্য নিয়োজিত হইল। তখন তাহার ফলে বিরাট যজ্ঞকাণ্ড চলিতে লাগিল।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

এ দিকে দুরাচার কংসের উৎপীড়নে বসুমতী প্রপীড়িতা হইলে দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহাদেবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দুষ্কর্ম্মশীল কংসের বিনাশ সাধন জন্য সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। বেদ মন্ত্রে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, হরিনাম গানে হৃদয়-তন্ত্রী নাচিতে লাগিল; এমন সময় এক অপূর্ব্ব আকাশ বাণী সকলের শ্রুতিগোচর হইল। তখন প্রজাপতি বিধাতা সেই দৈববাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন অমরগণ! আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই ভগবান হরি পৃথিবীর বিপন্ন বার্ত্তা অবগত আছেন। তিনি শীঘ্রই কংসধ্বংসাবতার বসুদেবের

গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন, তোমরাও আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্ম গ্রহণ কর এবং যে ভগবতী বিষ্ণু-মায়া জগৎ বিমোহিত করেন তিনিও ভগবানের আদেশে কার্য্য সিদ্ধির জন্য যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হইবেন।

বিধাতা এইরূপে পরমপুরুষ ভগবানের আদেশানুযায়ী দৈববাণীর কথা সকলকে জানাইয়া বিবিধ আশ্বাস বাক্যে বসুমতীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক নিজ ধামে গমন করিলেন। অপরদিকে মথুরার সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের রাজন্যবর্গের সম্মিলিত সাহায্যসম্ভূত যজ্ঞের ফলে যে অপূর্ব্ব বর লাভ হইল তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে বসুদেবের প্রতি সমর্পিত হইলে সকলে জানিতে পারিলেন যে, দেবকীর গর্ভে এমন এক অসামান্য সন্তানের উৎপত্তি হইবে যাহাতে সকলের কামনা পূর্ণ হইতে পারিবে, জগতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সংঘটিত হইয়া ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইবে। তখন সকলে সতৃষ্ণহৃদয়ে সেই অসাধারণ দৈবপুরুষের জন্ম-প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিলেন।

নারদ সংবাদ।

সংসারে এরূপ অনেক লোক বিদ্যমান আছেন যাহারা নিজেদের স্বার্থ থাকুক বা নাই থাকুক একের গুপ্ত মন্ত্রণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরের নিকট প্রকাশ করিতে না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তাহাদের হৃদয়ের অশান্তি—মনের অস্থিরতা কিছুতেই নিবারিত হয় না। জগতে সেই সকল লোকের কার্য্যপরম্পরাই কলহ

সংঘটনের মূলসূত্রস্বরূপ এবং তাহাই নারদ সংবাদের রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বে মানব চরিত্রের এইরূপ বৈচিত্র বিধানই "নারদ" নামের গূঢ় রহস্য প্রকাশক। রাজা বিশ্বস্ত অমাত্যসহ মন্ত্রণা-গৃহে বসিয়া গোপনে যাহা স্থির করিলেন, তাহাই আবার কোন্ সূত্রে, যাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হইয়াছিল তাহারই কর্ণগোচর হইল, দাবানলের যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি পড়িল, সংসারচক্রের ঘূর্ণন পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। বিধাতার সৃষ্টিরহস্য কার্য্যকারণের এরূপ সহায়তাজ্ঞাপক ঘটনাপরম্পরার সংঘটনবিধানই নারদ-চক্রের অপরূপ মাহাত্ম্য এবং এই মহিমা লইয়াই শাস্ত্রে নারদ নামের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

এই জন্যই মথুরার অনতিদূরে গোবর্দ্ধনগিরি প্রদেশে বসুদেবের গৃহে কংসের বধোপায় মন্ত্রণা হইতেছে, এবং তাঁহারই ঘরে দুর্বৃত্ত কংসের বিনাশকর্ত্তার আবির্ভাব হইবে এ সকল কথা নারদচক্রে মথুরাধিপতি কংসের কর্ণগোচর হইতে বাকি রহিল না।

দেবর্ষি নারদ, দেবগণের অংশ সকল ও স্বয়ং বিষ্ণু কংসের অত্যাচার নিবারণ জন্য মহীতলে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া সেই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরে আগমন করিলেন। উগ্রসেননন্দন কংস মহামুনি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সমাদরে উপবেশন করাইল।

নারদ যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বাগত সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, বীরবর! পৃথিবীর ভারভূত অসুরদিগের সংহারের নিমিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক উদ্যোগ হইতেছে; শুনিলাম স্বয়ং বিষ্ণু আপনার বিনাশ সাধনের জন্য আপনারই কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভূত হইবেন, সুতরাং যাহাতে আপনি এ

সকল অবগত হইয়া সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারেন তজ্জন্য আপনাকে সংবাদ দানের নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি সমস্ত অবগত হইয়া, যেরূপ বিহিত বিধান বিবেচনা করেন সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন। এই কথা বলিয়া নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বসুদেব সংবাদ।

বলদর্পিত কংস নারদের মুখে এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যদিও স্বীয় অনুচরবর্গের নিকট তেজগর্ব্ব বাক্যে তাহা অগ্রাহ্য করিতে লাগিল এবং দেবর্ষি নারদকে কলহপ্রিয় ও ভেদশীল বলিয়া তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইল না, কিন্তু নিজের অন্তঃকরণে কেমন এক আশঙ্কা অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই আশঙ্ক-মেঘ হৃদয়াকাশে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অন্তরের উদ্বেগ ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। তখন প্রাণের সেই বিষ-কণ্টক সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য দুরন্ত কংস কৃপাণ হস্তে ভগিনীসকাশে উপস্থিত হইল এবং তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে বলিতে লাগিল পাপীয়সী! তুই আমার মৃত্যুর কারণ স্বরূপা, তোর গর্ভজাত সন্তান হইতেই আমাকে কাল-কবলিত হইতে হইবে; তোকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী হইতে দূরীভূত করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই।

মহামতি বসুদেব অর্দ্ধাঙ্গিনীর এবম্বিধ বিপদ দর্শন করিয়া দুষ্টপ্রকৃতি কংসকে মিষ্ট বাক্যে কতকটা সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক উপ-

দেশচ্ছলে বলিতে লাগিলেন শূরশ্রেষ্ঠ! তুমি ভোজবংশের যশস্কর। শূরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তুমি এহেন কীর্ত্তিমান ও তেজস্বী হইয়া সামান্য অবলা রমণীর হত্যা কাণ্ডে হস্ত কলঙ্কিত করিবে? বীরবর! দেহধারীর মৃত্যু দেহেরই সহিত জন্মগ্রহণ করে; অদ্যই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই দেহ নাশ প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর পরিত্যাগ করে। জাগ্রদবস্থায় দর্শন বা শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে সঞ্জাত হইলে, ঐ দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে মানব যেরূপ তদনুরূপ বিষয় স্বপ্নে দর্শন করে সেইরূপ জীব কর্ম্মবশতঃ স্মরণশূন্য দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে এবং দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সময় নানা বিকারাত্মক মন, ফলাভিমুখ কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মায়া দ্বারা নানা দেহ রূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয় সেই সেই রূপেই দেহী জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ যেরূপ তৈল-ঘৃত জলাদি পার্থিব পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ জীব এই অবিদ্যা রচিত গুণের অনুগত হইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এবম্প্রকার মোহাচ্ছন্ন যে পুরুষ আপনার মঙ্গল কামনা করেন তিনি কাহারও উপর কখন হিংসা করিবেন না। কারণ যিনি অন্যের হিংসা করেন অন্য হইতে তাঁহারও হিংসিত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং পরকালেও যম-যন্ত্রণার ভয় আছে। দেখ, তোমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী ভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তুমি যেরূপ ভাবী ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে তাহাতে এই অবলা রমণী হইতে তোমার তাদৃশ ভয়ের সম্ভাবনা নাই; ইহার

র্ভজাত পুত্র হইতেই যদি অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে ইঁহার পুত্রদিগকে জন্ম মাত্রই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তুমি ইচ্ছামত আপনার মঙ্গল বিধান করিতে পারিবে এবং তাহা হইলে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।

মহামতি বসুদেবের এই যুক্তিযুক্ত উপদেশ বাক্যে কংসের মন কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। সে দেবকীর বিনাশ সাধন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু স্বীয় ভগিনী দেবকী ও তদীয় স্বামী বিজ্ঞপ্রবর বসুদেব উভয়কেই স্বীয় বন্দীগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, চতুর্দ্দিকে রীতিমত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়ে কংসের পুরীর মধ্যে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

——00——

দেবকীর গর্ভ বিবরণ।

যথাসময়ে দেবকী গর্ভ ধারণ করিয়া একটি সন্তান প্রসব করিলেন। প্রসব মাত্রেই সন্তানটি দুরাত্মা কংসের হস্তে সমর্পিত হইল। নির্ম্মমহৃদয় উগ্রসেন-তনয় সদ্যোজাত সন্তানকে ভাবী-সংহারকর্ত্তার মূল ভাবিয়া তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। এইরূপে দেবকীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে যে ছয়টি সন্তান উদ্ভূত হইল সেই ছয়টিই ক্রমে ক্রমে পাপাশয় কংসের হস্তে সমর্পিত ও সেই মুহূর্ত্তেই তৎকর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইল।

সন্তানবিয়োগকাতর স্বামীর সেবার জন্য বসুদেবের অপরা মহিষী রোহিণীদেবী কংসের কারাগারে আসিয়া পতির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেবকী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। গর্ভলক্ষণ অবগত হইবামাত্রই বসুদেবের শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পুণ্যব্রত বসুদেব একান্ত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এবার দেবকীর গর্ভে জীবাত্মার সঞ্চার না হইয়া রোহিণীর উদরে স্থান লাভ করিলে আমার বংশ রক্ষা হইলেও হইতে পারিত। স্বামীর এই অভিলাষ উভয় বনিতাই জানিতে পারিলেন, পতিব্রতা রমণীদ্বয় পতির মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কায়-

মনচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধুহৃদয় বসুদেবও ঐকান্তিক চিত্তে ঐ বিষয়ের অনুধ্যানে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। অহো! ইচ্ছাশক্তির কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য, ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা খেলা! সত্য সত্যই রোহিণী গর্ভ ধারণ করিলেন; বোধ হইল যেন দেবকীর গর্ভ সঙ্কর্ষণ-বলে রোহিণীর জরায়ু মধ্যে সংস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ রোহিণীর গর্ভলক্ষণ সমুত্থানের সহিত দেবকীরও গর্ভপাত হইয়া গেল। বসুদেব মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, অনন্ত দয়াময় ভগবানের কৃপায় দেবকীর গর্ভস্থিত ভ্রূণ রক্ষার জন্য তাহা যেন সঙ্কর্ষিত হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু অপরাপর নরনারীবর্গ সকলে জানিতে পারিল যে, দেবকীর এই সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল। এদিকে বসুদেবপত্নী রোহিণীও গর্ভবতী হইয়া নন্দগোকুলে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীগণও কংসভয়ে ভীত হইয়া ইতিপূর্ব্বেই অলক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী গর্ভ পরিহারের পর অতি অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় অপরূপ গর্ভশোভায় সুশোভিতা হইয়া উঠিলেন। এবার তাঁহার দেহ হইতে কেমন এক অপূর্ব্ব দীপ্তি বিকাশ পাইতে লাগিল। যে কেহ সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যপরিশোভিত দেহের দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। একদা কংস গৃহ মধ্যে স্বীয় ভগিনীর দেহবিনিঃসৃত স্বর্গীয় প্রভা অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আমার গৃহ মধ্যে দেবকীর এরূপ দীপ্তি আর কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হয় আমার প্রাণহর হরি ইহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমার কি

করা কর্ত্তব্য? দেবকীকে বধ করিলে স্ত্রী হত্যা, ভগিনী হত্যা, গর্ভিণী হত্যা পাপে কলঙ্কিত হইতে হইবে; তাহাতে যশ, শ্রী এবং পরমায়ু দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি কেবল হিংসা রত থাকিয়া জীবন ধারণ করে সে প্রকৃত পক্ষে জীবন্মৃত। সেই পাপী যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন তাহাকে সকলের নিন্দাভাজন হইয়া জীবন ধাবণ করিতে হইবে এবং মরণান্তে নিশ্চয়ই তাহাকে বিষম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। প্রভাবশালী কংস এইরূপ ঘোরতর চিন্তা হেতু স্ত্রী-হত্যারূপ মহাপাতক হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া হরির প্রতি বৈরতা সাধন জন্য তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু দিবা-রাত্রের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও কংস শান্তি লাভ করিতে পারিল না। উপবেশন শয়ন, পান ভোজন, ভ্রমণ ও অবস্থান সর্ব্ব সময়েই দেবকী গর্ভস্থিত বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল।

গোপরাজ নন্দ বার্ষিক কর প্রদানের জন্য প্রতি বৎসরই কংসালয়ে আগমন করিতেন এবং সেই সময় বন্ধুবর বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এবার নন্দ আগমন করিলে বসুদেব রোহিণী ও তদীয় পুত্রের সংবাদ গ্রহণ ও তাহার প্রতিপালনের ভার নন্দ হস্তে সমর্পণ করিয়া নন্দালয়ের অন্যান্য সংবাদের সহিত জানিতে পারিলেন যে, তদীয় বনিতা যশোদাদেবী এতদিনের পর গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি আসন্নপ্রসবা; দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি প্রসূতিপদে পদার্পণ করিবেন.

অনন্তর নন্দ প্রস্থান করিলে পর বসুদেব ভাবিতে লাগিলেন যে, দুষ্ট দমনের জন্য—দুরাত্মা কংসের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত

যে মহাযজ্ঞ সমারব্ধ হইয়াছিল তাহার ফলভোগের অবসর কোথায়? জন্মমাত্রেই ত আমার সন্তানগুলি পাপাশয়ের হস্তে নিহত হইতেছে। তবে এক্ষণে উপায় কি? কিন্তু কংসের মুখে তাহার ভয়ের কারণ স্বরূপ যাহা শুনিয়াছি, যজ্ঞকুণ্ডের পবিত্রাত্মা হোতাগণ যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেবকীর অষ্টম গর্ভ-জাত সন্তান কর্তৃকই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে, জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, দুষ্টের দমন সাধিত হইবে। বিশেষতঃ এবার, দেবকীর গর্ভ লক্ষণে যেরূপ অলৌকিক চিহ্ন সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে কোন এক অসাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। পবিত্রচেতা বসুদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঐকান্তিক চিত্তে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং ঐরূপ অনুধ্যানেই তাঁহার দিবারাত্র অতীত হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ।

আজ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী; জয়ন্তী নিশায় রোহিণী নক্ষত্র উদিত হইয়াছে, অশ্বিনী অভিজিৎ সমাযুক্ত ভাবে দেখা দিয়াছে, অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথে জগতে কেমন এক অপরূপ শোভা বিকাশ পাইল—দিঙ্‌মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল, আকাশের তারকাবর্গ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদী সকলের সলিল স্বচ্ছভাব ধারণ করিল, জলাশয়ের বক্ষে কমলদল শোভা পাইল, বিটপীশিরে পুষ্প স্তবক ফুটিয়া

উঠিল, মলয় সমীর মনোরম সুবাস বহন করিয়া সুখস্পর্শভাবে সুমন্দ হিল্লোলে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। এহেন বিজয় মুহূর্ত্তে শেষ রাত্রে পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবকীর গর্ভ হইতে যেন ভগবান হরি আবির্ভূত হইলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেব দেখিতে পাইলেন যে, এই দিব্য লাবণ্যময় অপূর্ব্ব শিশুর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা পাইতেছে, হস্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, পদদ্বয়ে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখা দিতেছে। বসুদেব এই অলৌকিক শোভাসমন্বিত দিব্য চিহ্নে বিভূষিত অসামান্য শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়োৎ-ফুল্ল লোচনে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, হায়! কিরূপে এহেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় সন্তানকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের হস্তে তুলিয়া দিব? যাহার রূপপ্রভায় সূতিকালয় আলোকিত হইয়াছে, যাহার সমাগমে আমার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া মনের অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, সে হেন প্রাণধনকে কিরূপে নির্ম্মম দুরাচারের হস্তে বিনষ্ট হইতে দেখিব? ভগবান আপনিই কোন উপায় করিয়া দিন যাহাতে অভাগার হৃদয়সর্ব্বস্ব দুরাত্মা কংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বসুদেবের হৃদয়-বল যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল; পৃথিবীর ভার হরণের জন্য, জগতের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত, পাপময় সংসারে পুণ্য-ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যেন ভগবান হরি শিশুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথাই তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। দৈববিশ্বাস বলবতী হইয়া উঠিল। এমন সময় অকস্মাৎ কে যেন কি তাঁহাকে বলিয়া দিল, নন্দের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল। তখন মহামতি বসুদেব

ভাবিতে লাগিলেন জগতের হিতের জন্য, সংসারের পরিত্রাণের নিমিত্ত, সাধারণকে দুরাচারদিগের প্রবল অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যদি এই অলৌকিক সন্তানের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রাণ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও ইহাকে গোকুলে নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। যদি দৈবক্রমে তথায় কোন শিশু সন্তানের জন্ম সংঘটিত হইয়া থাকে তবে পরস্পর পরিবর্ত্তিত করিয়া আপাতত কংসের অনুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। সমস্ত জগতের হিতের জন্য—সাধারণ প্রজামণ্ডলীকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত—অধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিয়া সংসারে পুণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত থাকা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিদ্যুৎ গতিতে এরূপ চিন্তা হৃদয়ে প্রতিভাত হইবামাত্রই বসুদেব নবজাত সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

এদিকে, ভগবানের অপূর্ব্ব মায়া কে বুঝিতে পারে, পবিত্র-চেতা বসুদেবের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই যেন অকস্মাৎ প্রকৃতি-দেবী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আকাশমণ্ডল ঘোর ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল, চতুর্দ্দিক ঘন তিমিরাবৃত হইয়া পড়িল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়া দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা দিল। তখন প্রহরী-গণ এ দুর্য্যোগে কেহই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিল। বসুদেবও সুযোগ বুঝিয়া শিশু ক্রোড়ে বন্দী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া বৃষ্টিপাত হইতে শিশুর দেহ রক্ষা করিতে করিতে পশ্চাদগামী হইলেন, স্বয়ং 'ধর্ম্মরাজ' শৃগাল রূপে অবতীর্ণ হইয়া পথ দেখাইয়া

অগ্রগামী হইতে লাগিলেন, যমুনা আপনার তরঙ্গবেগ প্রশমিত করিয়া বসুদেবের উত্তীর্ণ হইবার সুবিধা বিধান করিয়া দিল।

যাহা হউক বসুদেব সেই নিশীথ সময়ে দুর্য্যোগ সহায়তায় গোপনে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তত্রত্য গোপকুল নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভগবানের কৃপায় যশোদাদেবী অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই এক কন্যা রত্ন প্রসব করিয়া তখন পর্য্যন্তও অচেতনাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বলিতে পারে? ভগবান যেন ভক্তপ্রবর বসুদেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই সমস্ত সুযোগ একত্র সংঘটিত করিয়া দিলেন। বসুদেব যশোদার শয্যা পার্শ্বে স্বীয় শিশু সন্তানকে শয়ান রাখিয়া তদীয় কন্যা-রত্ন ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে কংসালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অন্তর্হিত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

অনন্তর অরুণদেব সময় বুঝিয়া পূর্ব্ব দিক নবরাগে রঞ্জিত করিয়া মানব নেত্রের গোচরীভূত হইলেন। কংসও দেবকীর প্রসব-সংবাদ অবগত হইবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যগ্রতা সহকারে সূতিকাগারে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া দেবকী সতী নিতান্ত কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ভ্রাত! এটি তোমার ভাগিনেয় নহে, ভাগিনেয়ী। স্ত্রীবধ করা তোমার ন্যায় ধীমান ব্যক্তির কিছুতেই কর্ত্তব্য হয় না। একে একে তুমি আমার ছয়টি শিশুকে বধ করিয়াছ, একটি সন্তান আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি; আমি ত তোমার সহোদরা ভগিনী, এই অভাগিনী ভগিনীকে শেষ সন্তানটি ভিক্ষা স্বরূপ দান কর।

এই বলিয়া দেবকী সেই কন্যাকে আলিঙ্গনভরে বুক মধ্যে লুকাইয়া নিতান্ত কাতরার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতার চরণতলে পড়িয়া ভগ্ন কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তথাপি ক্রুর-প্রকৃতি কংসের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না, নির্ম্মম দানব ভগিনীর ক্রোড় হইতে কন্যাটিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইল। কঠোর স্বার্থ বশতঃ তাহার আত্মীয়স্নেহ মায়ামমতা সমস্তই উন্মূলিত হইয়াছিল, সে সেই সদ্যোজাতা ভগিনী-সুতার পা ধরিয়া যেমন শিলা পৃষ্ঠে আছাড় মারিতে উদ্যত হইল অমনি মায়াদেবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে বিভাসিত হইয়া উঠিল—দেবীর অষ্ট ভুজে ধনু, শূল, বাণ, বর্ম্ম, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছে, দেহ দিব্যমাল্য বসন, লেপন ও রত্নাভরণে বিভূষিত রহিয়াছে, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর, উরগাদি সকলে যেন পূজোপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার স্তব গান করিতেছে। তখন আত্মহারা কংসের বোধ হইল যেন মায়াদেবী এইরূপে আবির্ভূত হইয়া জলদ গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিতেছেন—রে দুর্ম্মতে! অকারণ শিশু সন্তান বধ করিয়া কেন পাপ বৃদ্ধি করিতেছিস্, যাঁহার হস্তে তোর মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে তিনি যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন কালের অদৃষ্টনেমী তোর পতন সময়ে তাঁহাকে তোর সম্মুখে সমানীত করিয়া দিবে, কিছুতেই সে কাল-চক্র হইতে তোর পরিত্রাণ নাই। তবে কেন বৃথা অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে বধ করিতেছিস্, এরূপ বৃথা হত্যাকাণ্ডে আর হস্ত কলঙ্কিত করিস্ না।

কংস বিস্ময়ভরে কিয়ৎ ক্ষণ আত্মহারা হইয়া পড়িল—তাহার স্বার্থ চিন্তা লোপ পাইল। ইতি মধ্যে মায়াদেবী সেই সদ্যোজাতা কন্যা সহ যেন অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। কংস আত্ম সংবরণ

করিল, কিন্তু তাহার প্রকৃতি যেন কিয়ৎকালের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে দেবকী ও বসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে বিলাপস্বরে বলিতে লাগিল, ভগিনী ও ভগিনী-পতি! তোমরা আমার আত্মীয়; আমি নিতান্ত স্বার্থান্ধ হইয়া নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় তোমাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে বধ করিয়াছি। হে মহাভাগ দম্পতি! পুত্রদিগের জন্য তোমরা দুঃখ করিও না। জীবগণ দৈবের অধীন, কেহই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না, সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। "আমি হন্তা বা আমি হত হইলাম" আত্মার প্রতি এইরূপ বোধ দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির যত দিন থাকে তত দিন সে দেহের নাশ হইলেই "আমার ধ্বংস হইল" ভাবিয়া পরের বৈরী হয় এবং পরকে আপনার বৈরী করে। যেরূপ পৃথিবীতে পার্থিব ঘটাদি উৎপন্ন হইয়া আবার ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু মৃত্তিকা লোপ পায় না; সেইরূপ দেহাদিই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, আত্মার বিকার হয় না। যাঁহারা ইহা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে না পারে তাঁহাদেরই দেহে আত্ম বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে; সেই বুদ্ধিহেতু ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই ভেদজ্ঞান হইতে পুত্রাদি দেহ সহ যোগ ও বিয়োগ হয়: সেই যোগ বিয়োগ হইতে সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। ইহারই নাম সংসার-চক্র। জ্ঞানোদয় না হইলে সংসার-চক্র হইতে মুক্তিলাভ হয় না, সংসার নিবৃত্তি ঘটে না। তোমরা দুই জনই সাধু ও বন্ধুবৎসল; তোমরা ইহা বুঝিয়া নিজ গুণে আমার দুর্বৃত্ততা ক্ষমা কর।

ভ্রাতাকে এইরূপ অনুতাপ করিতে দেখিয়া দেবকী শোকতাপ পরিত্যাপ পূর্ব্বক কংসের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

বসুদেবও রোষভাব ছাড়িয়া দিয়া প্রসন্নচিত্তে কংসকে নানা শাস্ত্র তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। কংসের মন আপাততঃ ধর্ম্ম পথের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু পরে দুষ্ট মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণায় পুনরায় হিংসা দ্বেষে প্রবর্ত্তিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব।

রজনী প্রভাত হইলে দিব্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া নন্দ ও যশোদা অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন। উদারমনা গোপরাজ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্ত্যয়নাদি সমাপনানন্তর যথাবিধি পুত্রের জাত কর্ম্ম, পিতৃ পূজা ও দেবপূজার অনুষ্ঠান করিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণগণও যথাযোগ্য দান প্রাপ্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নবজাত শিশুকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব সূচিত হইতে লাগিল। বংশকীর্ত্তক, বন্দনাকারী, সূত ও মাগধগণের স্বস্তি-বাচন উচ্চারণে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—গায়কেরা সুমধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ করিল, চতুর্দ্দিকে ভেরী, দুন্দুভি বারম্বার ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমগ্র ব্রজধাম বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মালা, চেলপট্ট, পল্লব ও তোরণ দ্বারা বিভূষিত হইল, গাভী বৃষ ও বৎস সকল তৈল ও হরিদ্রায় রঞ্জিত এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ মালা, বসন ও কনকদামে অলঙ্কিত হইয়া অপরূপ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। গোপগণ বহুমূল্য বসন, আভরণ, কঞ্চুক উষ্ণীষাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া হস্তে নানা উপহার লইয়া নব কুমারের মুখচন্দ্রিমা সন্দর্শনাভিলাষে নন্দালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচিত্র

বসনপরিধৃত বিবিধ কনকভূষণে সমলঙ্কৃত গোপবালাগণ নন্দালয়ে আসিয়া চিরঞ্জীব বাক্যে নবজাত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক পরস্পরের গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও জলসেক প্রক্ষেপ রূপ, আনন্দোৎসবে মাতিয়া সুমধুর সঙ্গীততানে নন্দব্রজ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল; গোপকুলও পরমানন্দে পুলকিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও বারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত এবং নবনীত লইয়া পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ বিলেপন করিতে করিতে ক্রমশঃ আনন্দহিল্লোল বাড়িয়া উঠিল, দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি লইয়া ক্ষেপণ ও প্রতিক্ষেপণ স্বরূপ উৎসবানন্দের হোলী খেলা চলিতে লাগিল। পৌরাণিক, মাগধ, বন্দী এবং অন্যান্য বিত্তোপজীবিগণ এই উৎসবোপলক্ষে সমাগত হইয়াছে দেখিয়া দানশীল উদারহৃদয় নন্দ তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রার্থনারূপ যথাযোগ্য দান করিলেন; সকলেই গোপরাজের বিনয়বদান্যতায় পরম প্রীতিলাভ করিয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে সন্তানের মঙ্গল-গীত গাহিতে লাগিল। এই সময় মহাভাগিনী রোহিণীও পুত্রের কুশল কামনায় দিব্যবসন, মাল্য ও কণ্ঠাভরণে ভূষিত হইয়া ভগবানের আরাধনা পূর্ব্বক যথাসাধ্য দান করিলেন। সকলেরই হৃদয় আনন্দহিল্লোলে নাচিতে লাগিল, ব্রজভূমি মূর্ত্তিমান সুখ-সৌভাগ্যের বিহার-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল।



চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা।

পূতনা বধ।

'আমার সংহারকর্ত্তা কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছে' এই ভাবনা মথুরাধিপতির হৃদয় হইতে কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না। কাজেই কংস নবজাত সন্তান মাত্রেরই উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন, যাহাতে তাহাদের বিনাশ সাধন হয় তাহাই তাহার অভিপ্রেত হইয়া রহিল। কিন্তু লোকলাজভয়ে এবং কতক বা সময়োত্থিত বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া সাধারণ সমস্ত শিশুহত্যা ব্যাপার রূপ নিতান্ত বিগর্হিত কর্ম্মে সহসা প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। তবে হৃদয়ের কুটিল ভাবও অন্তর্হিত হইল না, বিদ্বেষ-বহ্নিও ছাড়িতে পারিল না।

গোপরাজ নন্দের গৃহে জন্মোৎসবের বিরাট ব্যাপার শ্রবণ করিয়া দুষ্টমতি কংস সেই শিশুর বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কুটিল মন্ত্রণা ব্যতিরেকে অকস্মাৎ বল প্রয়োগ করিলে হিতে বিপরীত ফল ঘটিতে পারে ভাবিয়া নন্দের সহিত সদ্ভাব প্রদর্শন-চ্ছলে-স্বীয় ধাত্রীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিল। ধাত্রী শিশুপালন

সম্বন্ধে শিক্ষা দান ব্যপদেশে যাহাতে বধক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক কংসের অভীষ্ট সাধন করিতে পারে এরূপ কুমন্ত্রণায় অভিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিল।

বেশ-ভূষাসমলঙ্কৃত পরম রূপবতী কংস-ধাত্রী গোকুলে সমাগত হইয়া শিশুকে স্তন্য দান উপলক্ষে নন্দকুমারের দেহে ভীষণ "পূতনা ব্যাধি" সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। সূতিকাগারে পূতনা রোগ শিশুদিগের পক্ষে নিতান্তই দুষ্ট গ্রহস্বরূপ; রাত্রিকালে অবিশুদ্ধ বিষবৎ স্তন্য পান করান হইতেই সাধারণ শিশুঘাতিনী পূতনার উৎপত্তি ; আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বে পূতনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে তাহাই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে যথা—

অতীসার জ্বরস্তৃষ্ণা তির্য্যক প্রেক্ষণ রোদনং।
নষ্ট নেত্রস্তথোবিগ্না গ্রস্তঃ পূতনয়া শিশুঃ॥
ছর্দ্দিকাসো জ্বরস্তৃষ্ণা বসাগন্ধোঽতি রোদনং।
স্তন্যদ্বেষোঽতিসারশ্চ অন্ধঃ পূতনয়া ভবেৎ॥

কংসের প্রবর্ত্তনায় তাহার ধাত্রী কর্তৃক শিশুঘাতিনী পূতনা রাক্ষসী নন্দঘোষের নবকুমারের দেহে সঞ্জাত হইলেও পূর্ণ-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন যশোদানন্দনের দেহে তিষ্ঠিতে পারিল না। ফলতঃ দেহ স্বাস্থ্য-তেজে বলীয়ান থাকিলে প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে অনেক সময়েই অনেক রোগ বিনা ঔষধেই বিদূরিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-বলে বলীয়ান্ যশোদানন্দনেরও তাহাই ঘটিল। শিশু সবলে ধাত্রী স্তন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। দুগ্ধে বিতৃষ্ণাই পূতনাব্যাধির প্রধান লক্ষণ, তাহাই যখনি অন্তর্হিত হইল, তখন কাজে কাজেই পূতনা রাক্ষসী লোপ পাইল। দুষ্কর্ম্মশীলা কংস ধাত্রীও সফলকাম হইতে পারিল না দেখিয়া এবং হয়ত

শীঘ্রই তাহার অভিপ্রায় সকলের সমীপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় তথা হইতে সরিয়া পড়িল। নবকুমারও পূতনা রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহাকে দেহ হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ইহাই শাস্ত্রতত্ত্বে "পূতনা বধ" নামে অভিহিত, পৌরাণিক বর্ণনায় ইহাই নানা রূপকালঙ্কারে সমলঙ্কৃত। পাঠক! কৃষ্ণ চরিত্রে এইরূপ আবরণ অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন; ভক্তিবারিবিধৌত বিচার-বুদ্ধিতে তাহা ভেদ করিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে চেষ্টা করিবেন।

শকট ভঞ্জন।

কোন কোন শিশুর শারীরিক বল এত অধিক দৃষ্টিগোচর হয় যে, পঞ্চমবর্ষীয় বালকও তাহাদের তেজ সহ্য করিতে পারে না; যশোদানন্দনের শারীরিকযন্ত্রের পূর্ণতানিবন্ধন তাহার দৈহিক তেজও বিস্ময়কর ব্যাপার সংসাধনের উপযোগী ছিল। একদা যশোদা পুত্রটীকে শকটনিম্নে শয়ান রাখিয়া কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকিলে যশোদাকুমার স্তনপান করিবার জন্য রোদনপরায়ণ হইয়া হস্তপদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতে লাগিল। শিশুর সতেজোৎক্ষিপ্ত পাদদ্বয় সংঘাতে শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন শকট-স্থিত ঘৃত দধি ভাণ্ডাদি পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে বহুল শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ শুনিয়া যশোদা ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিলেন। দেখিলেন, শকট বিপর্য্যস্ত ও তদুপরিস্থিত ঘৃতভাণ্ডাদি ভগ্ন হইয়াছে, শিশু অক্ষতদেহে উত্তানভাবে শয়ান

রহিয়াছে; কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তথায় অবস্থিত বালকবৃন্দের মুখে সন্তানের পাদতাড়নায় এরূপ ঘটিয়াছে শুনিলেও সন্তানের এই অসাধারণ বলের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দৈবগ্রহে এরূপ ঘটিয়াছে ভাবিয়া গ্রহ-শান্তির জন্য দৈবক্রিয়া করাইতে লাগিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলায় "শকট-ভঞ্জন" নামে সমাখ্যাত।

তৃণাবর্ত্ত বধ।

আর একবার ব্রজধামে ভয়ানক আবর্ত্তময় ব্যাত্যার উৎপত্তি হইয়া অনাবৃত স্থানে শায়িত যশোদানন্দনের প্রাণশঙ্কট উপস্থিত করিয়াছিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তৃণগুচ্ছধারী হৃষ্টপুষ্ট সবল শিশুর ভার-ময় দেহ ব্যাত্যাবেগে তেমন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিল না; সামান্য আঘাতে তেজস্বশালী শিশু তেমন কাতরও হইল না; বিশেষতঃ এরূপ আবর্ত্তময় ব্যাতার কেন্দ্রস্থল একস্থানে অতি অল্পক্ষণ মাত্রই স্থিতিলাভ করিতে পারে; সুতরাং অতি অল্পক্ষণ পরেই এই নবকুমার, সন্তানের অকস্মাৎ বিপদ্‌পাতে রোরুদ্যমানা জননী যশোদার ক্রোড়ে সমানীত হইল; তৃণপত্রাদি সহ আবর্ত্তমান ব্যাত্যাও ক্ষণমধ্যে অন্তর্দ্ধান পাইল। পুত্রবৎসলা মাতা ইহাকে পুত্রের অমঙ্গল হেতু পরিসৃষ্ট রাক্ষসী-মায়া ভাবিয়া সন্তানকে বক্ষঃমধ্যে চাপিয়া লইয়া শত শত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রেও ইহা তৃণাবর্ত্ত-রাক্ষসরূপে কল্পিত হইয়া রূপকাবরণে ইহাই "তৃণাবর্ত্ত-বধ" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ।

যদুবংশের কুলপুরোহিত মহাতপা গর্গমুনি বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দধামে সমাগত হইলে যশোদানন্দনের ও রোহিণী কুমারের দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কার ও নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রোহিণীনন্দন বলরাম নামে এবং যশোদাকুমার "কৃষ্ণ" নামে আখ্যাত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন।

ক্রমে দিন-যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণও জানু ও হস্তদ্বয় দ্বারা বিচরণ করিতে শিখিয়া গোকুল মধ্যে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার অল্পকাল মধ্যেই উভয়ে জানুঘর্ষণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক পাদ দ্বারা বিচরণ করিতে শিখিলেন। তাহাদের বাল্যকালীন অপরূপ রূপমাধুরী যে কেহ অবলোকন করিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ব্রজকামিনীগণ আপনাদের শিশুসন্তান, গৃহকার্য্য ভুলিয়া শিশুদ্বয়ের ক্রীড়া দর্শন পূর্ব্বক পরম প্রীতিরসে আপ্লুত হইত। বিশেষতঃ যে কেহ দিব্যকান্তি কৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন তিনিই যেন নিজ পুত্রকে বক্ষঃস্থল মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন ভাবিয়া অনন্ত আনন্দলাভ করিতেন। কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই যেন সকলকে সমানভাবে দেখিতেন। মাতার নিকট থাকিয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, অপর ব্রজকামিনীর নিকটে যাইয়া তাহার ক্রোড়ে উত্থিত হইয়া সেইরূপ ভাবই দেখাইতেন, সেইরূপ আনন্দই প্রকাশ করিতেন। মাতা যশোদার মনে যেন ইহাতে হিংসাভাব প্রবে-।

দিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সন্তান তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য কেন অধিকতর আগ্রহভাব প্রকাশ করিবে না, মাতৃস্নেহে কেন অধিকতর বদ্ধ হইবে না, তাহাই যশোদার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি মায়াবন্ধনে শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধ করিবার জন্য নানারূপ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না। দেখিলেন এ সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িতেছে! কৃষ্ণ যখন যাহার ক্রোড় অধিকার করে, তখন তাঁহারই সন্তানরূপে পরিণত হয়; এ দৃশ্য মায়ের অন্তরে বড় ভাল লাগিল না; তাঁহার সন্তান তাঁহার সহিত অপরের বিশেষত্ববোধ তেমন উপলব্ধি করে না দেখিয়া অন্তরে ব্যথা পাইতে লাগিলেন।

মাতা যশোদার এ প্রয়াস শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত রহিল না; তিনি মায়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া একদিন এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, মাতা তাঁহাতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন এবং এতক্ষণে পুত্র আমার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ইহাই যশোদা কর্ত্তৃক "শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।

মানব নানাবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন। এই সংস্কারের অধীন হইয়া অনেকে অনেকরূপ সৎকার্য্য হইতে বিরত থাকেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কারণ বশতঃ সেই সময়ের জন্য যাহা নির্দ্ধারিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ের সেই কারণ অন্তর্হিত হইলেও তাহা সমাজে বিরাজমান থাকে! ইহাই কুসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ। হয়ত নন্দব্রজে এইরূপ সংস্কার বশতঃ এবং অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় যুগ্মভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্রজবাসীগণ তাহাতে হস্তার্পণ করিতেও সাহসী হইতেন না! কিন্তু অর্জ্জুনবৃক্ষের ত্বক বালকবালিকাদিগের আমাশয়াদি রোগে বিশেষ হিতকর ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। এমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আয়ত্বাধীনে থাকিতেও কুসংস্কারের ভয়ে কার্য্যে লাগাইতে পারিত না। নির্ভীকহৃদয় শ্রীকৃষ্ণের মনে সেই কুসংস্কারের বিভীষিকা স্থান পাইল না। তিনি সেই সংস্কারের মূলচ্ছেদন জন্য বৃক্ষদ্বয়ের ত্বকমাত্র সংগ্রহে চেষ্টা না দেখাইয়া একবারেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই অসাধারণ বালকের

অসম সাহসিকতা ও অপরিমিত বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কৃষ্ণের পূর্ণশক্তির অনন্ত স্তবক ক্রমশ বিকশিত হইতে লাগিল।

বৃন্দাবনে পুরী স্থাপন।

নন্দব্রজের অপর পারে দুরাত্মা কংসের মথুরারাজ্য, মধ্যে যমুনানদী ব্যবধান মাত্র। কংসের এত সন্নিকটে নিরুপদ্রবে বাস করা সম্ভব নহে ভাবিয়া এবং সেই সময় ঘোষপল্লীতে বৃকের উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নন্দ উপনন্দাদি বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ গোপগণ ঘোষপল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস-নিকেতন সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সমীপে বৃন্দাবন নামক এক মনোহর বনভূমি দর্শন করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপনের জন্য মনোনীত করিলেন। ইহা শষ্পভোজী প্রাণীকুলের মনোমুগ্ধকর তৃণলতাদিতে পরিপূর্ণ এবং নূতন নূতন অবান্তর বনপ্রদেশে পরিবেষ্টিত। গোপগণ, সেই স্থানে পশুকুল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিবে এবং গোপীগণও সুখে বাস করিবে দেখিযা সকলে একমতাবলম্বন পূর্ব্বক গোকুল পরিত্যাগে যত্নবান হইলেন। সকলে আপন আপন শকট সমূহ যোজনা করিয়া তাহার উপর সমুদায় গৃহোপকরণ এবং বৃদ্ধ বালক ও স্ত্রীগণকে সংস্থাপন করিলেন। নিজেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গোধন অগ্রে লইয়া শৃঙ্গ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে পুরোহিত সমভিব্যাহারে চারিদিক হইতে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণও এই সঙ্গে রথোপরি আরোহণ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গোপগণ নানা বন উপবন, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, অতিক্রম পূর্ব্বক স্বর্গসুখাবহ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে শকটপুঞ্জ স্থাপনানন্তর গোকুলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিজেরাও যথাবিধানে স্ব স্ব বাসস্থলেব প্রতিষ্ঠা করিয়া সুন্দর পল্লীর সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ বৃন্দাবন-ধাম সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

বৎসাসুর, বকাসুরাদি বধ।

শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ গোপবালকগণকে হইয়া বৃন্দাবনের সন্নি-কটে বৎসচারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য যথাবিধানে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সেই বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছিল। তিনি গোপবালক-দিগকে যেমন প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, গোবৎসদিগকেও তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এমন কি, বনের বানরও তাঁহার দয়ার পাত্র ছিল। ফলতঃ সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন তাঁহার জীবনে শিক্ষার বিষয় না হইয়া স্বভাবজাত প্রবৃত্তিরূপে দেখা দিয়াছিল।

গোবৎসগণ যথেচ্ছ বিচরণকালে যাহাতে কোনরূপে হিংসিত বা বিনষ্ট হইতে না পারে সে দিকে দয়াবতার শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যে কোন বিরোধী প্রাণী (অসুর)কে হিংসা কার্য্যে সমুদ্যত দেখিতেন তাহারই বিনাশ সাধন পূর্ব্বক বন ভূমি নিষ্কণ্টক করিতে প্রয়াস পাইতেন। ইহা হইতেই বৎসাসুর, বকাসুরাদি বধের উৎপত্তি।

অঘাস্থর বধ।

নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য গুণে সকল গোপগণেরই অতীব প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহবাস ব্যতিরেকে কাহারই মনে তৃপ্তি হইত না, তাঁহার অদর্শন ঘটিলে কাহারও মনে শান্তি থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণ এই স্বকুমার বয়সেই সকলের মনোহরণ করিয়া তাহাদিগকে জগতের এক স্বপ্রশস্ত সরল পথে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বাল্যকালে অনেকেই কল্পনা-রথে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব পুরীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই বয়সেই তেজস্বিনী কল্পনাকে কার্য্যকরী শক্তির সহচরী করিয়া লইলেন। তিনি গোপবালকদিগকে প্রাণের সহিত মিশাইয়া লইবার জন্য তাহাদের "অঘ" বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ এই আট প্রকার কোপজ দোষ ব্যসনের অন্তর্গত। এই ব্যসনকেই "অঘ" বলা যায়। গোপ বালকদিগের কাহারও কাহারও মধ্যে উক্ত ব্যসন দোষের কোন কোনটী বিদ্যমান আছে দেখিয়া তাহা হৃদয় হইতে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই "অঘ" রূপী অস্থর নিতান্তই দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে আবার ক্রুর-প্রকৃতি। এই জন্যই শাস্ত্রে ইহার সর্পরূপ বর্ণিত আছে।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনে ব্যসন পরিহারের দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সফলকাম হওয়া সহজ নহে দেখিয়া নিজে কর্ম্মাত্মিকা যোগে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। গোপ বালকগণও জগতে কর্ম্ম ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইলেন। কাজ

করিতে করিতে তাহাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া নিজেরা প্রীত হইতে শিখিলেন, পরস্পরের জন্য পরস্পর আত্ম বিসর্জ্জনে দীক্ষিত হইলেন। কাজে কাজেই তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রতারণা, নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি লোপ পাইল। ব্রজবাসী গোপকুলের "অঘ" বিনাশ প্রাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবলে অঘাসুরের বধ ক্রিয়া এইরূপেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শাস্ত্রে ইহাই হয়তঃ "অঘাসুর বধ" নামে বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মার মোহ নাশ।

ব্রজ বালকদিগের ব্যসন-বুদ্ধি দূরীভূত হইলে তাহারা ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন, যোগ-ধ্যানে রত হইলেন। কিন্তু গো-চারণ ক্রিয়া তাহাদের আর ভাল লাগিল না। তখন সকলে মিলিয়া গোবৎসের চিন্তা ছাড়িয়া যোগ বিদ্যার কথা ভাবিতে লাগিল, এই ব্রহ্ম বিদ্যারূপ মোহে কেহ আর গো-পাল লইয়া চরাইতে আসিল না; তখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মাঠে আর গো বৎসাদি সমাগত হইতেছে না দেখিয়া ব্রজ বালকদিগের অত্যধিক যোগ-বুদ্ধিরূপ মোহ বিনাশের জন্য স্বয়ং সকলের গোবৎসাদি লইয়া বৃন্দাবনে চরাইতে লাগিলেন।

বালকদিগের কোন কার্য্যে প্রথম যেরূপ উৎসাহ দেখা যায় শেষে সেরূপ থাকে না। ব্রজবালকগণও প্রথমে যোগ বিদ্যার মোহে যত দূর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল পরে তাহার বেগ প্রশমিত হইলে দেখিতে পাইল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত

গোপাল একাকী লইয়া মাঠে চরাইতেছেন। তখন তাহাদের চৈতন্য হইল। সংসার ক্ষেত্রে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিল শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম্মযোগ ভারত-লীলায় নানা শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিপুল বিটপীতে পরিণত হইয়াছিল, এই বাল্যকালে তাহারই অঙ্কুর নির্গত হইয়াছিল। ব্রজ বালক সমীপে শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম্ম ফলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই শাস্ত্রে রূপকালঙ্কারে ভূষিত হইয়া "ব্রহ্মার মোহ নাশ" নামে বিরাজিত হইয়াছে।

কালিয় দমন।

এক দিন বনমালী বন ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনা পুলিনের অনতিদূরে নির্ম্মল জলপূর্ণ সুবিস্তৃত এক রমণীয় হ্রদ দেখিতে পাইলেন। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে বিটপী শ্রেণী রাজপ্রাসাদের প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পত্রাদি যেন দগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি তথায় সমাগত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, এই হ্রদ দুর্জ্জয় কালিয় নাগের আবাস-ভূমি হওয়াতে অন্য কোন প্রাণীই ভয়ে জলস্পর্শ করিতে পারে না এবং তাহারই বিষ-তেজে বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত যেন দগ্ধপ্রায় হইয়া কালিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তখন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন যে, এরূপ স্বচ্ছতোয় সুপ্রশস্ত হ্রদ বিষধর সর্পের দৌরাত্ম্যে মানব ব্যবহারের অতীত হইয়া থাকিবে ইহা সঙ্গত নহে; ক্রুর-প্রকৃতি নাগের দমন হওয়া কর্ত্তব্য। সংসারে যাহা করণীয়, তাহাতে বৃথা কাল বিলম্ব করা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ নহে। তিনি অবিলম্বে উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক হ্রদ তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাঁহার শরীরের ছায়া হ্রদের জলে পতিত

হইবামাত্র ক্রূরমতি সর্প ফণা বিস্তীর্ণ করিয়া প্রতিবিম্বের উপর বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল।

সকলেই অবগত আছেন, সর্প সতেজে কয়েকবার দংশনাঘাত করিলেই তাহার দন্তমূলস্থিত গরল উদ্গীরিত হইয়া পড়ে। অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ হ্রদোপরি নমিতদেহ বৃক্ষের শাখায় আরূঢ় থাকিয়া সেই অবসরে সুবিস্তৃত ফণাধারী কালীয় নাগের মস্তকোপরি সবেগে পদাঘাত করিলেন। অমিত বীর্য্যবান শ্রীকৃষ্ণের সতেজ ক্ষিপ্ত পদাঘাতে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নাগরাজ ভগ্নশির হইয়া পড়িল। মৃত্যুভয়ে এহেন বিষধর সর্পও নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অপার করুণাময় বাসুদেব ক্রূরপ্রকৃতি সর্পের উপরও দয়া প্রকাশ করিলেন, তাহাকে প্রাণে মারিলেন না। কালিয় হ্রদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের করণীয় কার্য্য সম্পাদিত হইল, নাগরাজও তথা হইতে পলায়ন করিয়া বহু দূরে বিশাল সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইল।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়হ্রদ তীরে গমন বৃত্তান্ত কৃষ্ণসহচরগণ কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত হইবামাত্র গোপরাজ নন্দ অন্যান্য গোপগণের সহিত দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত অবগত হইয়া বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে দরদরধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিপদবার্ত্তা শ্রবণে মৃতপ্রায় যশোদার দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল, শোকাচ্ছন্ন গোপগোপীকুল আনন্দ ও বিস্ময়ভরে মাতিয়া উঠিল। ভীষণ কালিয় সর্পের ভয় অপনোদিত হওয়ায় স্বচ্ছতোয় কালিয় হ্রদ বৃন্দাবনবাসীর ব্যবহারোপযোগী হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এই কালিয়দমনের রূপকতা সম্বন্ধে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন আবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপদকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্য-শত্রু সকল এখানে লুক্কায়িতভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ বিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয় রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে পঞ্চেন্দ্রিয় ভেদে ইহার পাঁচটী ফণা এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তি বিকাশ পূর্ব্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কাল-তরঙ্গিনী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কাল-স্রোতস্বতীর আবর্ত্ত মধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়-বংশীধর মূর্ত্তি পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা।

বর্ষাকাল সমাগত। আকাশ বিদ্যুৎবিভাসিত নিবিড়-নীরদ জলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, অস্পষ্ট জ্যোতি সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সূর্য্যদেব অষ্ট মাস ধরিয়া যে সলিল সম্পত্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কাল উপস্থিত হইলে, স্বীয় কর দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকৃশ পাদপচয় বর্ষণ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল—ধরণী নূতন শস্যে পরিপূর্ণা, ইন্দ্রগোপ কীট সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ছত্রাক দ্বারা কৃতচ্ছায়া হইয়া পদ্মরাগমণিভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নূতন-ধন প্রাপ্ত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জলরাশি উন্মার্গবাহী হইয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণও সপ্তম বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। তিনি এই সময়ে গোপাল বালকদিগের সহিত নৃত্য গীতে উৎফুল্ল থাকিলেও দেখিতে পাইলেন যে, বর্ষাকালে শকটাবাস গাভী সমূহের উপযুক্ত অবস্থিতি-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তিনি অদূরবর্ত্তী গোবর্দ্ধন গিরির গুহা প্রদেশে গো-কুলের উপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের নিকট মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না; কর্ম্মগত বুদ্ধি হইতেই তাঁহার 'ভারকেন্দ্র বোধ জন্মিয়াছিল। তিনি ভাস্কর বিদ্যায়ও সুনিপুণ হইয় ছিলেন, সুতরাং তিনি নাতিবৃহৎ গোবর্দ্ধনের গুহা প্রদেশ ক্রমশ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন, উপরেও থিলান চক্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এদিকে বর্ষা-শরৎ-শীত-গ্রীষ্ম অতিবাহিত হইয়া গেল, আবার বর্ষা আসিয়া দেখা দিল। ইতিমধ্যে গোপগণ ইন্দ্র-যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিনয়াবনত হইয়া নম্রস্বরে বিজ্ঞপ্রবর বৃদ্ধ গোপদিগকে, কি নিমিত্ত কাহার উদ্দেশে এই সব যজ্ঞ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দ প্রত্যুত্তরে বলিলেন বৎস! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্য রূপী। মেঘ সমূহ তাঁহার প্রিয়তম মূর্ত্তি। এই বারিদ সমূহ হইতে বারি বর্ষিত হওয়াতেই শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা জীবগণের জীবন ধারণ এবং মানবগণের জীবিকা নির্ব্বাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই যজ্ঞ করিয়া থাকি। এইরূপ ক্রিয়া বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি কাম, দ্বেষ ভয় বা লোভ বশতঃ ইহা পরিত্যাগ করে তাহার কখনই মঙ্গল হয় না।

সর্ব্বজীবে দয়াপ্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। তিনি দেখিলেন, গাভীকুলের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের দিকে গোপগণের আর তাদৃশ দৃষ্টি নাই; তাঁহারা গোপালন অপেক্ষা ব্যবসাবৃত্তি অবলম্বনে অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছেন। এই ইন্দ্রযজ্ঞও সেই বাসনার সাহায্যকারী ক্রিয়াস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ শস্য-

জীবি ক্লষকদিগেরই ইন্দ্রানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকা কর্ত্তব্য; গো-প্রতিপালক গোপকুলের পক্ষে গো-পালকের মঙ্গলোদ্দেশেই যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিলেন, পিতঃ! জীবগণ কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায় এবং কর্ম্মবশেই মঙ্গলামঙ্গল সুখ দুঃখ লাভ করিয়া থাকে। অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছে তখন তাহাদের কাল্পনিক ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? জীব কর্ম্মবশেই স্ব স্ব দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই তাহা পরিত্যাগ করে—সুতরাং কর্ম্মই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকারী জীব কর্ম্মেরই পূজা করিবে। যিনি এক বস্তুর কৃপায় জীবন ধারণ করিয়া অন্য বস্তুর সেবা করেন তিনি মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয় পৃথিবীশাসন, বৈশ্য বার্ত্তা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বার্ত্তা চারি প্রকার—কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুশীদ। তন্মধ্যে আমরা গোপালন করিয়া থাকি। আমাদিগের পুর, জনপদ, গ্রাম, গৃহ কিছুই নাই—আমরা বনবাসী। অতএব গোগণ এবং আমাদের আশ্রয়ভূমি গোবর্দ্ধন গিরির উদ্দেশেই যজ্ঞ করা উচিত।

নবীন বালকের এহেন যুক্তিযুক্ত বাক্যে সকলে পরম প্রীত হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞ পরিবর্ত্তে গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহাতে গোগণ প্রচুর খাদ্য লাভ করিল, তাহাদের প্রতিপালনের দিকে গোপকুলের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইল; এবং গোবর্দ্ধন গিরির উপত্যকা প্রদেশে গোপগোপিনীদিগের বাসের উপযুক্ত জনপদ সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

দৈবক্রমে সেই বৎসর গুরুতর বর্ষার সহিত ঝড় বৃষ্টি দেখা দিল। প্রচণ্ড বায়ুবিতাড়িত মেঘ সকল বিদ্যুন্মালায় উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বজ্রনির্ঘোষের সহিত মুষলধারে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। নদীর জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, মহীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই মহাবর্ষণ দ্বারা পশুসকল কাঁপিতে লাগিল, গোপগোপীরাও শীতার্ত্ত হইয়া পড়িল। তখন বহু-কালাগত সংস্কারের বশীভূত গোপগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি কুপিত হইয়া এরূপ দুর্ঘটনা সঙ্ঘটন করিয়া দিতেছেন এবং সেই কথা কৃষ্ণের নিকট সকলে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুরন্ত বান ও ঘোরতর বর্ষা সমাগত হইয়া বৃন্দাবনের সকলকেই নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া তিনি সকলকে গোবর্দ্ধন গিরির কন্দর প্রদেশে লইয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই বৎসরাধিক ব্যাপী ঘোরতর পরিশ্রমের ফলে এবং কার্য্যকুশলতাগুণে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরিগুহা খিলানচক্রে সমধিক প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার নিম্নাবলম্বন খুলিয়া দিলেন। কিন্তু গোপগোপীকুল খিলানমধ্যে ভারকেন্দ্র-তত্ত্ব বুঝিত না; তাহারা পর্ব্বত প্রস্তর গুহামধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে ভাবিয়া কেহই তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাম হস্তে খিলানচক্র ধারণ করিলেন, তাহারা গোমণ্ডলী সমভিব্যাহারে সপরিবারে—পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিল। তাহাদের মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্ত দিনের পর ঝড়বৃষ্টি থামিয়া যাইলে সকলে তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলা দর্শনে

প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ গোপ গোপীগণ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। ইহাই পৌরাণিক তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ! ফলতঃ অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতই গো-বর্দ্ধন ব্যাপারই ধারণ করিযাছিলেন।



সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী-বিহার।

শ্রীকৃষ্ণের এই গোপিনীলীলা বুঝিবার পূর্ব্বে একবার ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব। আজকাল অনেকেই স্ত্রীপুরুষের প্রেমকে কামের সহিত একই স্তরে আনিয়া উপস্থিত করেন, কেহ বা রূপতৃষ্ণার সহিত মিশাইয়া ফেলেন, কেহ বা আবার স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে আবেগময় আসক্তি জন্মে তাহাকেই স্ত্রীপুরুষের প্রেম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কিন্তু বস্তুতঃ প্রেম ও কামে আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রেম বৃষ্টিপাতের পর প্রফুল্ল রবিরশ্মি, কাম রবিকরগ্রাসী তিমিররূপী মেঘযুক্ত ঝঞ্ঝাবাত; প্রেম চিরস্থায়ী নবীন মৃদুল বসন্ত, কাম অকালে আগত দুর্দ্দশা-পরিণামী শীত; প্রেমের পরিতৃপ্তিতে বিকাশ, কামের পরিতৃপ্তিতে বিনাশ; প্রেম সত্য, অবিনশ্বর, কাম মিথ্যাময়, প্রবঞ্চণাময় পাপে পরিপূর্ণ; প্রেম অন্যের নিমিত্ত আপনাকে বলিদান দিয়া উচ্চ হয়, কাম আপনার ক্ষণিক বিলাসের নিমিত্ত অন্যকে বলিদান দিয়া পাপের নিম্নাদপি নিম্নস্থানে অধঃপতিত হয়।

প্রেম হৃদয়ের অসদভিপ্রায় দমন করিয়া রাখে এবং শয়তানের শয়তানিক পরামর্শ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। প্রেমই

হৃদয়ের উচ্চভাব, আবার সর্ব্ববিধায়ে হিতকর। ইহারি বলেই মস্তকের গুরুভারও লঘু হইয়া যায়, আনন্দে পরের বোঝা বহন করিতে সমর্থ হয়। যখন হৃদয় প্রেমোৎফুল্ল থাকে, তখন ভারকে ভার বলিয়াই বোধ হয় না। অধিক কি, নিতান্ত কষ্টসাধ্য নিরানন্দময় ব্যাপারও সুখকর ও প্রীতিপ্রদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা মহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে আমাদিগকে উত্তেজিত করে এবং ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অন্তরে বলবতী বাসনা প্রণোদিত করিয়া দেয়। প্রেমের গতি ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী, নিম্নদিগের আকর্ষণ, বিঘ্ন বাধা না মানিয়া মনকে ক্রমশঃই উপরে লইয়া যায়। প্রেম অপেক্ষা কিছুই মধুরতর নাই, কাহারও শক্তি গুরুতর নহে, কোন ভাবই উচ্চতর নহে। ত্রিভুবনে প্রেমাপেক্ষা সুন্দরতর আর কিছুই নাই, কারণ প্রেম ঐশীশক্তি সমুদ্ভূত বলিয়া ইহা ক্রমশই সৃষ্ট পদার্থের সীমা ছাড়াইয়া অবশেষে ঈশ্বরত্বেই মিলিত হয়।

পাঠক! এহেন পবিত্র প্রেমের নাম লইয়া মায়াবী কাম-পিশাচকে অন্তরে আনিবেন না। ফলতঃ প্রেম বলেই পাশব কামের উচ্ছৃঙ্খল গতি রুদ্ধ হয় এবং প্রকৃত প্রেম ব্যতিরেকে সংসারে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবে না। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ এই সকল তত্ত্ব বুঝিয়াই গোপিনীদিগের মধ্যে পবিত্র প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে, পবিত্র প্রেম হৃদয়ের অভীষ্ট দেবতা স্বরূপ। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধি লাভ হয় না, জপ তপ ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেতন ও তপঃসিদ্ধি হয়।

এই মন্ত্র চেতনার নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা দিবার জন্যই বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ব্রজগোপীদিগের সহিত তাঁহার গুহ্যতম

সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রেমের এই গূঢ়তত্ব হৃদয়ঙ্গম্ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাকে কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাঠক! আসুন, আমরাও ভক্তিবারিবিধৌত হৃদয়ে ব্রজগোপিনীদিগের কৃষ্ণ-প্রেম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন বিহার।

বৃন্দাবনে বাসকালীন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই নৃত্য গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতপ্রবাহ তালমান লয় সম্বলিত বেণুবাদন যাহার কর্ণগোচর হইত তিনিই আত্মহারা হইতেন, তাঁহার নৃত্য ভঙ্গিমা যাহার নেত্র পথে পতিত হইত তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যশোদা নন্দনের মোহনমূর্ত্তি, তাঁহার রমণীয় স্বভাব, তাঁহার প্রফুল্ল বদন, তাঁহার প্রীতিময় ব্যবহার সকলেরই হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে সকলেরই মনে কেমন এক প্রফুল্লভাব উদিত হইত। গোপিনীগণও তাঁহার সহবাসে থাকিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে লাগিল, সঙ্গীত ভাল বাসিতে শিক্ষা করিল এবং তাহাদের হৃদয়ে পবিত্র প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল।

ব্রজ গোপীদিগের অন্তরের এই গুহ্যতম ভাব সূক্ষ্মদর্শী শ্রীকৃষ্ণের অপরিজ্ঞাত রহিল না। কোন সুন্দর বস্তু দেখিয়া মানব-হৃদয়ের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পৃথিবী হইতে যে ক্রমশঃ সর্ব্বনিদানভূত অনন্ত ঈশ্বরের প্রতি ধাবমান হয় ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। এক্ষণে তিনি ব্রজবাসাদিগের উন্মেষোন্মুখ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সহিত যাহাতে তাহাদের মনে

সচ্চিদানন্দের স্বরূপানুভূতি হইতে পারে তজ্জন্য লীলা বিস্তার করিলেন।

গোপীগণের প্রেম সাধনা।

বংশীধারী শ্রীনন্দনন্দনের ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি মনে মনে অনুধ্যান করিয়া গোপীগণ সেই হৃদয়ানন্দের উপাসনায় অনন্যচিত্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিয়া দিলেন, ক্রমশঃ তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হইতে লাগিল। কাহারও সরস হৃদযক্ষেত্রে সেই অঙ্কুর অতি শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হইয়া শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিশাল মহীরুহ রূপে ফল ফুল দান করিতে আরম্ভ করিল।

তখন কাহারও মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল— রসরাজ শ্রীনন্দনন্দন অধর সুধায় বেণুর রন্ধ্র পূরণ করিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকা-কুসুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইতেছে।

কেহবা প্রেমরসে বিগলিত হইয়া ভাবিতে লাগিল হায়! এই বংশী কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যই সঞ্চয় করিয়াছিল, নতুবা প্রেম-ময়ের সহচর হইবে কেন? হায়! যে অধর-সুধা হইতে প্রেম-সরিৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে এ বংশী একাকী তৎসমস্তই ভোগ করিতেছে। যাহাদিগের জলে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহার এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য দর্শনে সেই সকল জলাশয়ের বিকশিত কমলরূপ রোমরাজি শিহরিয়া উঠিয়াছে। বংশে ভগবৎসেবক পুত্ররত্ন সমুদ্ভূত হইলে তাহাকে দেখিয়া কুলবৃদ্ধেরা যেমন আনন্দে

অশ্রু মোচন করিতে থাকেন, এই বংশীর এতাদৃশ সৌভাগ্য দর্শনে ইহার বংশপতি বৃক্ষ সমূহ, মধুধারা রূপ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

কেহ বা ভাবিতে লাগিল যে, গোবিন্দের বেণু রব শ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ুর ময়ুরীগণ নৃত্য করিতেছে; তাঁহাদিগের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী স্ব স্ব চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে পর্ব্বতের সানু প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, সুখময় বৃন্দাবন অপূর্ব্ব শোভায় বিভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

কাহারও মনে উদিত হইল, গাভীগণ উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ বিনির্গত গীতামৃত পান করিতে করিতে মনোমধ্যে চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দুগ্ধপানপ্রবৃত্ত বৎস সকলও উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে ঐ গীত-সুধা পান করাতে স্তন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের নয়নও আনন্দাশ্রু ধারায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

গোপীগণ এইরূপ গোবিন্দ বিষয়ক নানাবিধ কল্পনায় মনকে তন্ময় করিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রেমময় মূর্ত্তির আরাধনা করিতে লাগিল। এইরূপ অনুশীলনের সহিত তাহাদিগের চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমের অনন্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে শিক্ষা করিল। তাহাদের হৃদয়স্থিত প্রেম-পদ্ম অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া আদৌ নাল পরে বৃন্ত অনন্তর মুকুলভাবে দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সাধনারূপ বায়ু সলিল-তাপে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইল। তখন গোপীগণ সেই প্রস্ফুটিত প্রেম-পদ্ম হৃদয়স্থিত দেবতার চরণে অর্পণ করিতে অভিলাষিণী হইল। প্রেমময় গোবিন্দও তাহাদের প্রেম-পদ্মে বিষ-কীট লুক্কায়িত আছে কি না তাহা দেখাইবার জন্য অভিনব লীলার অবতারণা করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

হেমন্তকালের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্য ভোজন করিয়া কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ করিল। কুমারীগণ অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া সলিল-তটে বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রেমময় গোবিন্দকে হৃদয়-স্বামী স্বরূপে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশে গন্ধ দ্রব্য, মাল্য, নৈবিদ্য, ধূপ, দীপাদি উপকরণ সামগ্রী দ্বারা পূজা করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের বাহু ধারণ করিয়া কালিন্দী জলে স্নান করিতে যাইবার সময় আপন আপন নামের সহিত শ্রীনন্দ নন্দনের গুণ গান করিত। এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইবার সময় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহারা আমাকে স্বামী স্বরূপে পাইবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু হৃদয়-স্বামী ও দেহ উপভোগের স্বামীর পার্থক্য ইহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কি না তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপভোগের কথা স্মরণ পথে উদিত

থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই লজ্জা বর্ত্তমান থাকিবে; কিন্তু উপভোগের ছায়া মাত্রও যখন তাহাদের মনে আর স্থান পাইবে না তখন তাহারা লজ্জাকে বিদায় দিতে সক্ষম হইবে। তাহারা সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে পর—যথার্থ প্রেম সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে—আমাকেও স্বামীরূপে পাইতে সক্ষম হইবে।

কৃষ্ণের এই সকল চিন্তার পর এক দিন সেই সমস্ত ব্রজকুমারী তীরে স্ব স্ব বস্ত্র রাখিয়া জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে রসরাজ নন্দদুলাল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ব্রজবালাগণ জলকেলি সমাপনান্তে উত্থান সময়ে তীরে আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বৃক্ষারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে বসন সহ তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া সকলেই লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি সকলেরই হৃদয় মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। তাহারা আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া আনত মস্তকে শ্যামসুন্দরের নিকট আপনাদের বসন প্রার্থনা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা শেষ হয় নাই, তিনি বসন প্রত্যর্পণে ওজর করিলেন। বলিলেন, তোমরা ব্রত আচরণ কালে বিবস্ত্রা হইয়া জলে স্নান করিয়াছ। ইহাতে জলদেবতার অপমান করা হইয়াছে। অতএব সেই পাপ দূর করিবার নিমিত্ত তীরে উত্থিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।

যাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠানভূত দেবতা স্বরূপে পাইবার জন্য এই কাত্যায়নী ব্রতের অবতারণা, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও কিসের জন্য আমরা এত লজ্জাভিভূত হইতেছি? অবিনশ্বর আত্মা যাঁহার

উপর সমর্পিত হইয়াছে, ক্ষণভঙ্গুর দেহের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মধ্যে কেন লজ্জার অন্তরাল দিতেছি? হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম দানে পূজা বিধানই যাঁহাকে লাভ করিবার এক মাত্র উপায়—ভোগ বিলাসের সামগ্রী বোধে লজ্জাকে আনয়ন করিয়া সেই পথ হইতে কেন আমরা দূরে গমন করিতেছি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রেমসাধনাতৎপর ব্রজকুমারীদিগের হৃদিস্থিত প্রেম-ভক্তির প্রস্রবণ শত মুখে প্রধাবিত হইল, ক্রমশঃ ভক্তি স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত লজ্জা ভয় ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহারা অন্তর মধ্যে এক মাত্র গোবিন্দের মোহন মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তখনি সেই তন্ময় অবস্থায়—আত্মহারা হইয়া গোপীগণ জল হইতে তীরে উত্থিত হইল এবং হৃদয়ের সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যোড়-হস্তে প্রণাম করিয়া তদ্প্রদত্ত বস্ত্র গ্রহণ করিল। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের সাধনার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতমনে তথা হইতে অন্তর্ধ্যান হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা।

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের মধ্যে প্রেম-ভক্তির অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম উৎকর্ষ সাধনের সহিত তাহাদিগকে প্রেম-তত্ত্বে সিদ্ধ করিবার জন্য, রাস-লীলার অবতারণা করিলেন। এই রাসলীলা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর অভিমতও এখানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধে উদ্ধৃত হইল;—

"রাস একটী ক্রীড়া বিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। শ্রীধর স্বামী

রাসের অর্থ এইরূপ বুঝাইয়াছেন যে, স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে তাহার নাম রাস। বালক বালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে তাহারাও দেশ বিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদি রসের নাম গন্ধও নাই।"

"যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ। কৃষ্ণ পক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপী পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্য বিকাশ, আর এক দিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্ট সাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে "পরাণুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহ ঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহ পরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম সুবাসিত, কুঞ্জবিহঙ্গম-কূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী এবং তন্মধ্যে অনন্ত সুন্দরের স্বশরীরে

বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্ত হইলে, তাঁহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

পাঠক! এই স্থানে একবার ভাগবতকারের রাস-লীলা বর্ণন হইতে প্রকৃত কথা জানিতে চেষ্টা করুন—শারদীয় শোভনীয় যামিনী সমাগত হইলে লক্ষ্মীদেবীর বদনমণ্ডল তুল্য শশধর অখণ্ড মণ্ডল ও নূতন কুঙ্কুম রাগের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া উদিত হইলেন। বনরাজি তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবন বিমোহনকারী মধুর গীতি গান করিতে লাগিলেন। ব্রজকামিনীগণ সেই আনন্দদীপক গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সকলেরই মন সেই দিকে প্রধাবিত হইল। কোন কোন গোপী দুগ্ধ দোহন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের গীত শ্রবণ মাত্র স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই সমুৎসুকভাবে যাত্রা করিল। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়া, কেহ কেহ বা পক্ক গোধুম-কণা না নামাইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুগণকে স্তন্যপান করাইতেছিল, কেহ কেহ বা স্বামীর সেবায় নিরত ছিল; কিন্তু তাহারা সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিল, আহার সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই অন্ন ত্যাগ করিয়া গমন করিল।

কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ গাত্র মার্জ্জন, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জন দান করিতেছিল—কিন্তু সমাপন না করিয়াই ধাবিত হইল। ফলতঃ যে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই কৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য সকল অপরিসমাপ্তি অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল।

এই তন্ময়ত্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম লাভ হইল। যিনি তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না, সংসারে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র বর্ত্তমান রহিল তাহার শ্রীকৃষ্ণের সহবাস লাভ ঘটিল না; সুতরাং যাহারা কৃষ্ণের সহিত নিজের পতিরও সত্ত্বা চিন্তা করিয়াছিল তাহাদিগকে কাজে কাজেই কৃষ্ণকে পতিভাবে কামনা না করিয়া উপপতিরূপে কামনা করিতে হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সশরীরে পাইল না। তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে কৃষ্ণসমীপে আসিতে দিল না, কৃষ্ণ-চিন্তানলেই তাহাদের জীবন আহুতি স্বরূপে প্রদত্ত হইল।

আবার যখন রাসমণ্ডল মধ্যে গোপীগণ উপস্থিত হইয়া আত্মারাম কৃষ্ণকে লইয়া রাসমহোৎসবে মোতিতে লাগিল, তখন যে মুহূর্ত্তে তাহাদের মনে অন্য কোনরূপ চিন্তার ছায়ামাত্র উদিত হইল সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন গোপিনীগণ নিতান্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিল। যাহাই উহাদের মনোনেত্রের গোচর হইল তাহাকেই উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কখন বা বনস্পতিদিগকে মানসনেত্রে দেখিয়া বলিল, হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! শ্রীনন্দের নন্দন আমাদিগের চিত্ত অপহরণ করিয়া কোথায় পলায়ন

করিয়াছেন তোমরা কি তাহা দেখিয়াছ? হে কুরবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁহার হাস্য মানিনীদিগের মান হরণ করে, সেই রামানুজ কি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়াছে? হে কল্যাণি তুলসি! হে গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে! তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি যুথিকে! মাধব কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন? হে চূত! হে পিয়াল! হে পনস—অসন—কোবিদার! হে জম্বু—অর্ক—বিল্ব—বকুল! হে আম্র—কদম্ব—নীপ! হে পরপ্রয়োজন-সাধনের-নিমিত্ত-সমুৎপন্ন যমুনাতীরবাসী অন্যান্য বৃক্ষসকল! শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা কি দেখিয়াছ? আমাদিগের চিত্ত শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আহা! বসুমতি, তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে? কেশবের পাদস্পর্শে তোমার আনন্দ জন্মিয়াছে, সেইজন্যই বুঝি তুমি বৃক্ষরাজি দ্বারা রোমাঞ্চিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ; নতুবা কিসের জন্য এত আনন্দ জন্মিয়াছে? হে হরিণপত্নীগণ! আমাদিগের অচ্যুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমাদিগের নয়নের তৃপ্তিদান করতঃ কি এই স্থানে আসিয়াছিলেন?

কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল গোপিনীগণ এইরূপ অনন্যচিত্তে কৃষ্ণবিরহ চিন্তায় আবার আত্মহারা হইয়া পড়িল—সংসার ভুলিয়া গেল—সমস্তই কৃষ্ণময় বোধ হইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় রাসমণ্ডলে আসিয়া দেখা দিলেন, গোপিনীগণের আশা পূর্ণ হইল। তাহারা কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা

করিল, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্বার্পণে সামর্থ্য লাভ করিল, ভক্তিপ্রেমে সিদ্ধ হইবার অধিকারিণী হইল, রাসলীলার প্রকৃত ফল দেখা দিল।

পাঠক! শ্রীকৃষ্ণের এই রাসমণ্ডল আমাদেরই হৃদয়পদ্মে সংস্থিত। আমরা যখন সংসার ভুলিয়া—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন স্বার্থপরার্থ সমস্তই বিস্মৃত হইয়া—একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারি, তখনই ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদের হৃদয়পদ্মে আসিয়া মোহন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তখন আমাদের মানসপটে রাসলীলা সমারম্ভ হয়। সেই সময় প্রেম-ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া যিনি যে ভাবে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রজগোপীগণ এইরূপ সাধনায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য ভোগানুরাগের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা গোপিণীদিগের প্রেমভক্তি বলে ভগবানে সেই তন্ময়ত্ব লাভের রূপকালঙ্কার-ভূষিত অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই আরাধনায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি "রাধা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-"আরাধিকা" হইতে রাধিকা নামের উৎপত্তি।

কেহ কেহ রাধাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া থাকেন। "রাধা-কৃষ্ণের বিধিসম্পাদিত পরিণয় শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্ত্তি এবং রাধাকৃষ্ণের বিহার সেই শক্তিরই বিকাশ।" পরমাত্মার সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার কৃষ্ণের সহিত রাধার সেই সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাই তিনি কৃষ্ণের মুখে রাধিকার

এইরূপ পরিচয় দিতেছেন—কৃষ্ণ রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"তুমি যেখানে আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্ব্বদাই বিরাজমান আছি। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুত বীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি তখন লোকে আমাকে "কৃষ্ণ" বলে, তোমার সহিত থাকিলে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধার স্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ব্বশক্তি স্বরূপা। হে সুন্দরী! আমি যখন যোগ দ্বারা সর্ব্ববীজ স্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ব্বস্ত্রী-রূপধারিণী হও।"

পাঠক! এই প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে অধিক ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নাই। আইস! আমরা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলনে প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলিত শক্তির বিকাশ দেখিয়া সংসারে সেই শক্তিতত্ত্ব লাভের জন্য প্রেমময় ভক্তিভরে যুগল-মূর্ত্তির চরণপদ্ম প্রাণ ভরিয়া পূজা করি। নীরস যুক্তিবাদের উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে না যাইয়া প্রেমতত্ত্বের সরসক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তি-কুসুম সঞ্চয়ে চেষ্টা করি।

নবম অধ্যায়।

—:*:—

বৃন্দাবনে শেষ লীলা।

অরিষ্টাসুর বধ।

এক দিন গোচারণ কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বামবাহুমূলে বা কপোল স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রূ নর্ত্তন করিতে করিতে, কোমব অঙ্গুলি দ্বারা সপ্ত ছিদ্র রোধ করিয়া অধরার্পিত বংশী বাদন করিতে ছিলেন, তখন দূরে অবস্থান করিলেও, চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াে ব্রজের বৃষ, মৃগ, গাভীগণ দন্ত দ্বারা কবল ধারণ এবং কর্ণ উৎক্ষি করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দলে দলে দাঁড়াইয়াছিল এবং সরোবর সমস্ত সারস হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ মনোহর রবে হৃষ্টচিত্ত হইয় তথায় আগমন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে, নিমীলিত নয়নে নীরবে যে শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছিল। সেই সময় এক প্রকাণ্ড বন্য বৃ শৃঙ্গদ্বয় প্রহারোদ্যত করিয়া ভীম বেগে তথায় উপস্থিত হইল অসীম বলশালী শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ এই বিপৎপাত দর্শন করিয় প্রাণভয়ভীত গোপগোপীগণের রক্ষার্থ সেই দুষ্ট বৃষের শৃঙ্গদ্ব ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পশ্চাৎদিকে দূরে বিক্ষেপ করিলেন। তখন ক্রোধভরে উন্মত্ত হইয়া দ্বিগুণ তেজে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুে ধাবিত হইল। জনার্দ্দন তখন পুনরায় তাহার শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্ব চরণ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ধরণীতলে নিপাতিত করিলেন এব

আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় তাহাকে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। পরে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে ঘোরতররূপে ভয়ঙ্কর বেগে আঘাত করিবামাত্র সে রক্তবমন ও মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিতে করিতে শমন সদনে প্রস্থান করিল। এই প্রকাণ্ডাকার বৃষ দুষ্টমতি কংস প্রেরিত অরিষ্টাসুর নামে অভিহিত এবং এই অসুর সদৃশ ভীমপরাক্রম বৃষের নিধন সাধনই "অরিষ্টাসুর বধ" নামে কথিত হইয়াছে।

একদিন নন্দদেব যমুনা জলে স্নান করিতে যাইয়া অকস্মাৎ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে জলে ঝম্পপ্রদান করিলেন এবং বয়স দশম বৎসর পূর্ণ না হইলেও অসাধারণ শক্তিবলে পিতাকে নিমজ্জিতপ্রায় অবস্থা হইতে উত্তোলন করিলেন।

অনন্তর আর একদিন নন্দ বনমধ্যে শয়ান অবস্থায় এক প্রকাণ্ড সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। সেবারও শ্রীকৃষ্ণ পিতার বিপদ দেখিয়া এরূপ সবলে সর্পের মস্তকে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই সর্প পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে দুইবার আসন্নপ্রায় মৃত্যুগ্রাস হইতে উদ্ধার করেন।

কেশীবধ।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, এতদিন ধরিয়া বৃন্দাবনবাসী গোপবালকদিগকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন তাহাদের হৃদয় মোহমদে আবৃত হইয়া তৎসমুদায় বিনষ্ট হইবার উপক্রম

ঘটিতেছে, তখন কর্ম্মপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সংসারে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দেখাইয়া দিয়া তাহাদের মোহ-মদ বিদূরিত করিতে লাগিলেন। এই জগদাবরক মোহই শাস্ত্রে 'কেশী' নামে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজবাসীদিগের মোহ বিনাশই "কেশী বধ" নামে সমাখ্যাত।

কংসের মন্ত্রণা।

কৃষ্ণ বলরামের অমিত পরাক্রম, অসাধারণ তেজ, বীর্য্য এবং অলৌকিক কার্য্য পরম্পরার কথা নারদ-চক্রে দুষ্টমতি কংসের কর্ণগোচর হইলে সে ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি যাহার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, যাহার বিনাশের জন্য ভগিনীর সদ্যোজাত শিশু সন্তানদিগকে স্বহস্তে নিহত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না, আমার সেই শত্রুই বৃন্দাবনে দিনে দিনে শশী কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! আমি এখনও পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না। আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তাহারা যৌবনকালে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহারা পূর্ণ যৌবনে সম্যক দৃঢ়তা লাভ করিলে সহজে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না। চানুর ও মুষ্টিক নামে আমার দুই জন মহাপরাক্রান্ত অনুচর আছে; তাহাদিগের সহিত মল্ল যুদ্ধ করাইয়া আমি সেই রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব। ধনুর্যজ্ঞ নামক এক মহাযজ্ঞের ছলে সেই বালকদ্বয়কে ব্রজভূমি হইতে আনয়ন করাইয়া আমি এইরূপ চেষ্টা করিব যাহাতে সেই বালকদ্বয় নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত

হইবে। এক্ষণে আমি যদুপুঙ্গব অক্রূরকে তাহাদের আনয়নের জন্য ব্রজধামে প্রেরণ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকৃষ্ণকে প্রকারান্তরে মথুরায় আনয়নের জন্য অক্রূরকে রথারোহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিল। ফলতঃ কংস যখন চরমুখে অবগত হইল যে, বসুদেবই স্বীয় অষ্টম পুত্রকে জন্মমাত্রেই নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে এবং সেই পুত্রই কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে অসুর নিপাত করিতেছে, তখন নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া বসুদেবকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু যখন তাহার মনে উদিত হইল যে, সে উগ্রসেনের ঔরস পুত্র নহে, ক্ষেত্রজ পুত্র মাত্র। সুতরাং বসুদেবতনয়ই প্রকৃত পক্ষে মথুরার সিংহাসনের অধিকারী।—অতএব বসুদেবকে এক্ষণে হত্যা না করিয়া বদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং অগ্রে তাহার পুত্রদ্বয়ের বিনাশ সাধন করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া দুর্ম্মতি কংস বসুদেবকে সস্ত্রীক লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

অক্রূর সংবাদ।

অক্রূর মথুরাধিপতি কংসের আজ্ঞা পাইয়া কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য এবং ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে গোপরাজ উপহারাদি লইয়া যাহাতে মথুরায় আগমন করেন সেই রাজাজ্ঞা জানাইবার নিমিত্ত রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এমন

কি পুণ্য করিয়াছি, এমন কি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছি যে, অদ্য কেশবের সাক্ষাৎ পাইব? যিনি দৃষ্টিমাত্রে কার্য্য ও কারণের কর্ত্তা, তথাপি যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি আপন তেজ দ্বারা তমো জন্য ভেদ-ভ্রম দূরীকরণ করিয়াছেন কিন্তু সেই ভেদ ভ্রম দর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আপনাতে বিরচিত জীবগণের সহিত বৃন্দাবনে কেলি-কানন ও গোপীদিগের গৃহে লীলাবশে কর্ম্ম করত অশক্তের ন্যায় অভিমুখ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও কীর্ত্তি আলোচনা করিলে অসীম পাপ বিনাশ পায়, জগৎ জীবিত, শোভিত ও পবিত্র হয়—সেই শ্রীমূর্ত্তিধারী কেশব আমার নয়নগোচর হইবেন। তাঁহারা নেত্রপথবর্ত্তী হইবামাত্র আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়া যোগীজন আরাধ্য রামকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নমস্কার করিব। তাঁহারা, কংস আমাকে প্রেরণ করিয়াছে অতএব এ ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় দূত বলিয়া মনে করিবেন না; কারণ তিনি অচ্যুত সর্ব্বদর্শী। আমার চিত্তের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যেরূপ চেষ্টা তৎসমস্তই অবগত আছেন। আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠ মিত্র ও জ্ঞাতি, তিনি ভিন্ন আমার অন্য দেবতা নাই। যদি তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেন তাহা হইলে আমার আত্মা পবিত্র হইবে—কর্ম্মবন্ধন তৎক্ষণমাত্রে এই দেহ হইতে শিথিল হইয়া পড়িবে। তাঁহার কেহ প্রিয়, অতিশয় মিত্র কিম্বা অপ্রিয় দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য নাই, তথাপি যেরূপ কল্পপাদপকুল আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অভিলষিত ফল প্রদান করে, সেইরূপ তিনি ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অক্রূর গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার ভক্তিপ্রবাহ

উথলিয়া উঠিল, দেহ রোমাঞ্চিত মন স্তম্ভিত এবং নয়নযুগল অশ্রু-জলেপ্লাবিত হইল। অনন্তর অক্রূর ব্রজের গো-দোহন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় গো-বৎসগণের মধ্যে দ্বিতীয় কৈলাশশিখরের ন্যায় বলভদ্র এবং প্রফুল্ল নীলোৎপলদল সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের পরিধানে নীল ও পীত বস্ত্র ; নয়নযুগল শরৎকালের পদ্মের ন্যায় সুশোভন, তাঁহাদিগের বর্ণ শ্বেত ও শ্যাম, তাঁহাদিগের বাহু আজানু-লম্বিত ; তাঁহারা কিশোরবয়স্ক হইলেও তাঁহাদিগের বিক্রম বাল-হস্তীর সদৃশ ; তাঁহাদিগের দৃষ্টি দয়া ও হাস্য মণ্ডিত এবং ক্রীড়া উদার ও মনোহারিণী। তাঁহাদের গলে রত্নহার ও বনমালা শোভা পাইতেছে, তাঁহাদের অঙ্গ পবিত্র চন্দনে অনুলিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল যেন আলোকিত হইয়াছে। এহেন সুন্দরশ্রেষ্ঠ রাম-কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া অক্রূর রথ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিলেন এবং প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের চরণ প্রান্তে প্রণত হইলেন।

অনন্তর রাম-কৃষ্ণ অক্রূরের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে আলিঙ্গন দান করিলেন এবং হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। সেখানে স্বাগত সম্ভাষণের পর যথাবিধানে অতিথি সৎকার সমাহিত হইল। পরে নন্দরাজ অক্রূরকে কহিলেন হে দাশার্হ! নির্দ্দয় কংস সন্নিধানে, পশুঘাতী ব্যাধ কর্ত্তৃক পালিত মেষের ন্যায়, তোমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ? ক্রূরমতি কংস স্বীয় প্রাণ পরিপোষণেই সচেষ্ট, সে ক্রন্দনাকুলা স্বীয় ভগিনীর সন্তান সকল সংহার করিয়াছে। তোমরা তাহার প্রজা, তাহার নিকট তোমাদের জীবনই সংশয়াপন্ন, অতএব তোমাদের কুশলাকুশল চিন্তা আর কি করিব?

পরে দুষ্টদমন দেবকীনন্দন অক্রুরের নিকট আগমন করিয়া, বন্ধুদিগের প্রতি কংস কিরূপ আচরণ করিতেছে এবং কিরূপ করিতে অভিলাষী তৎসমুদায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্রুর প্রত্যুত্তরে সমস্ত বর্ণনকালে বসুদেবের কারারোধ-বার্ত্তাও জ্ঞাপন করাইলেন এবং সে দুরাত্মা শীঘ্রই যে তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া নন্দরাজকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে তাহাও উল্লেখ করিলেন।

রাম-কৃষ্ণ সমস্ত অবগত হইয়া ধনুর্যজ্ঞে গমন করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং নন্দকে কংসালয়ে উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য রাজাজ্ঞা বিশেষ করিয়া জানাইলেন। নন্দ গোপদিগকে যাবতীয় গো-রস গ্রহণ, রাজোচিত উপঢৌকন সংগ্রহ এবং শকটসমূহ যোজনা করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। বৃন্দাবনবাসীর গৃহে গৃহে রাম-কৃষ্ণের মথুরা গমনের কথা ঘোষিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা।

ব্রজের গোপগোপীগণ, রামকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রুর আসিয়াছে, শ্রবণ করিয়া শোক-দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। নিদারুণ মনোব্যথায় বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের সন্তাপজনিত দীর্ঘশ্বাসে কাহারও মুখকান্তি ম্লান হইয়া পড়িল, শরীরগ্রন্থি শিথিল হইল, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল। তাহারা গোবিন্দের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিয়া বিধিকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল—অহো বিধাতঃ! তোমার কিছুমাত্রও দয়া নাই, তুমি দেহী-দিগকে প্রেমবন্ধনে যুক্ত করিয়া নিতান্ত অসময়েই অনর্থক

বিয়োজিত করিয়া দাও। মুকুন্দের যে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলে আবৃত, সুন্দর কপালে ও নাসিকায় সুশোভিত এবং ঈষৎ হাস্যে পরম রমণীয়তা-প্রাপ্ত, সে হেন সৌন্দর্য্যময় বদন-কমল একবার দেখাইয়া আবার নয়ন-পথের অন্তরাল করিতেছ! যে চক্ষু দ্বারা আমরা এক স্থানে তোমার নিখিল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দর্শন করিতাম তুমি 'অক্রূর' নাম ধারণ করিয়া নিতান্ত ক্রূরের ন্যায় আমাদের সেই চক্ষু হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছ। হায়! আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। যিনি দিবাবসানে খুরোত্থিত ধূলিজালে ধূসরিত অলক ও মাল্য ধারণ পূর্ব্বক গোপগণের সহিত বংশীবাদন করিতে করিতে হাস্যসহকৃত কটাক্ষবিক্ষেপসহকারে ব্রজে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, তিনি ব্যতীত আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব?

এইরূপ বিলাপ ও কাতরোক্তির মাঝে রামকৃষ্ণ অক্রূরের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। নন্দাদি গোপগণ দুগ্ধপূর্ণ অসংখ্য কলস উপঢৌকন লইয়া শকটযানে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। যাহারা বৃন্দাবনে রহিলেন তাহাদেরও চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। গোপীগণ যতক্ষণ রথের কেতু ও ধূলি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। দেখিতে দেখিতে রথ অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তাহাদের শোকসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল। অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে—শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা।

দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পশ্চিম দিক অরুণ-বরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সেই সময় অক্রূরের রথ রামকৃষ্ণ সহ মথুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে রমণীয় উপবন সন্দর্শন করিয়া রাম-কৃষ্ণ নন্দাদি সহ তথায় রাত্রি অতিবাহনের জন্য মনস্থ করিয়া অক্রূরকে মিষ্ট সম্ভাষণে বিদায় দিলেন। অক্রূর তথা হইতে কংসরাজ গৃহে গমন পূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন।

বাসুদেব পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সঙ্কর্ষণ শ্রীদাম সুবলাদি সখাগণ সমভিব্যাহারে মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, উজ্জ্বল স্ফটিক বিনির্ম্মিত অত্যুচ্চ অট্টালিকা সমূহ রাজমার্গের দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্য-কিরণে রঞ্জিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই সমস্ত অট্টালিকার সুবর্ণবিনির্ম্মিত দ্বার সমূহ তাম্রনির্ম্মিত অর্গল দ্বারা অবরুদ্ধ। কোথাও বা আবার মনোহর উপবন, কোন স্থানে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান সকল স্বর্ণবর্ণসদৃশ কৃত্রিম তাল বৃক্ষে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে পারাবত, কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বরে নগরবাসীদিগের চিত্ত-

রঞ্জন করিতেছে। সুপ্রশস্ত চতুষ্পথ, ধনি-ভবন, গৃহোচিত্ত উপবন, ব্যবসায়ীদিগের মণ্ডলী ও অন্যান্য গৃহ সকল মথুরাপুরীকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

এদিকে যাঁহার অসামান্য কার্য্যকলাপের কথা বৃন্দাবন হইতে মথুরাপুরী পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইত সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন বার্ত্তা নগর মধ্যে প্রচারিত হইলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই কৌতূহলের সহিত রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। যে সমস্ত কুলবধূগণ রাজপথে বহির্গত হইতে না পারিলেন তাহারা কেহ বা উচ্চ অট্টালিকায় ছাদোপরি থাকিয়া, কেহ বা গবাক্ষ দ্বার দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাম কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ঘনশ্যাম অঙ্গে মনোহর পীত বসন, সেই কমণীয় কান্তিযুক্ত মুখারবিন্দে মৃদুমন্দ হাস্যরেখা, সেই মাধুর্য্যপূর্ণ কমল লোচনে মনমুগ্ধকর কটাক্ষ, সেই বিশাল বক্ষে দোদুল্যমান অপূর্ব্ব বনমালা, সেই সুঠাম সুগঠিত হস্ত-পদাদিতে দিব্য আভরণ, বক্র গ্রীবার নিম্নে সেই উজ্জল কৌস্তুভমণি, সেই মেঘবিভ্রম বক্র কেশোপরি মনোহর মুকুটমালা, সুচিক্কণ নাসিকোপরি শুভ্রকান্তি তিলকদাম, সেই নিরূপম কর্ণ যুগলে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়, সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত ভক্তগণাশ্রিত চরণ-পদ্মের ধীরে ধীরে বিক্ষেপণ—যাহার নয়ন পথে পতিত হইল সেই ব্যক্তিই বিমুগ্ধ চিত্তে বিভ্রান্ত হৃদয়ে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল যেন তাহাদের মন-ভৃঙ্গ প্রাণ ভরিয়া সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে।

কংস বধ।

এদিকে কংস রামকৃষ্ণের নগর-প্রবেশ সংবাদ অবগত হইয়া মল্লক্রীড়া মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ দিল। পুরুষেরা রঙ্গস্থলের পূজা করিয়া তুরী. ভেরী বাদন করিতে লাগিল; মঞ্চসকল মাল্য, পতাকা, চৈল ও তোরণে অলঙ্কৃত হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি পৌর ও জনপদবাসীগণ সেই সকল মঞ্চে যথাসুখে উপবেশন করিল। রাজগণ আসন গ্রহণ করিলে কংস অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া রাজমঞ্চে মণ্ডলেশ্বরদিগের মধ্যভাগে উদ্বিগ্নমনে উপবিষ্ট হইল। নন্দাদি গোপগণ ভোজরাজ কর্তৃক আহূত হইয়া উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক এক মঞ্চোপরি স্থান গ্রহণ করিলেন। বাদ্য বাজিতে লাগিল, ক্রমশঃ মল্লতালের আলাপ-চারী হইলে দর্পিত মল্লগণ যথাবিধানে সজ্জিত হইয়া উপাধ্যায়-দিগের সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চাণুর, মুষ্টিক, কূট শল, তোশল, ইহারা সকলে মনোহর বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া মল্লরঙ্গে আগমন করিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি সমভিব্যাহারে রাজসভায় সমাগত হইলে প্রথমে ধনুর্যজ্ঞশালে প্রেরিত হইলেন। সেখানে প্রকাণ্ডাকার ধনু প্রদর্শিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকারী জনগণ সমক্ষে সেই বিপুল শরাসন বামকরে গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন। অতঃপর মদমত্ত করী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে, সেইরূপ সেই বিপুল ধনু আকর্ষণ করিয়া মধ্যে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন! ধনুর্ভঙ্গ শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল, ক্রূরমতি কংসেরও হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

অনন্তর রামকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপনীত হইলে কংসের আদেশে কুবলয় নামক মত্ত হস্তী তাঁহাদের দিকে প্রধাবিত করা হইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবেশ রচনা পূর্ব্বক সুবক্র অলকজাল বন্ধন করিয়া হস্ত দ্বারা সেই ক্রুদ্ধ হস্তির শুণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম স্থলে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সেই মত্তমাতঙ্গ যাতনায় অস্থির হইয়া মাহুতকে ভূমিতলে ফেলিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই মর্ম্মস্থলে আঘাত জনিত তীব্র যাতনায় করিবর ভূমিতলে পতিত হইল; তখন শ্রীকৃষ্ণ অপরিমিত বলসহকারে তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং মল্লদুন্দুভির শব্দ শুনিয়া বীরমূর্ত্তিতে সভা-স্থলে আসিয়া দেখা দিলেন। স্কন্ধে দন্ত স্থাপিত, সর্ব্বাঙ্গ মদকণায় রঞ্জিত এবং বদনাম্বুজে ঘর্ম্মবিন্দু সমুদ্গত। তাঁহাদের এই বীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কংসের মনে কেমন এক বিভীষিকাময় আতঙ্কের উদয় হইল। স্বয়ং কৃতান্তদেব যেন তাহাকে লইবার জন্যই এইরূপ বেশে সমাগত হইয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল।

যাহা হউক, কংস তাহাদিগকে হস্তী যুদ্ধে পরিশ্রান্ত দেখিয়া ইহাই সুযোগ বিবেচনা পূর্ব্বক চানুর ও মুষ্টিক নামক প্রসিদ্ধ মল্ল-দ্বয়কে ইঙ্গিত করিল। রাজার ইঙ্গিত ক্রমে চানুর রাম-কৃষ্ণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল, হে নন্দনন্দন, হে রাম! তোমরা দুই জন বীর্য্যবান বলিয়া খ্যাত এবং বাহু যুদ্ধেও বিশেষ দক্ষ; রাজা তোমাদিগের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তোমাদের মল্ল ক্রীড়া দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব আইস আমাদের সহিত মল্ল ক্রীড়া করিয়া রাজার প্রিয় সাধন কর।

বাহু যুদ্ধে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মল্লদিগকে অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—রাজার ইষ্ট সাধন করিব, এই আদেশ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ স্বরূপ। কিন্তু আমরা বালক; অতএব আমাদের সমান বলশালী বালকদিগের সহিত যেরূপ বাহুযুদ্ধ হয় সেরূপ ক্রীড়া কবিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইলে মল্ল সভাসদ্‌-দিগকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। চানুর কহিল তুমি কিম্বা বল-দেব দেখিতে বালক হইলেও বলশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ; অত-এব যাহারা বলী, তোমাদিগের সহিত তাহাদিগেরই মল্ল ক্রীড়া কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। হে নন্দনন্দন! আইস তুমি আমার উপর বিক্রম প্রকাশ কর; আব মুষ্টিক, বলভদ্রের সহিত মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

কৃষ্ণ বলরাম এইরূপে মল্লযুদ্ধে আহূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ চানুরকে এবং রোহিণী-নন্দন মুষ্টিককে ধারণ করিলেন। হস্তদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বয় এবং উভয় পদ দ্বারা উভয় পদ বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর পর-স্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিভ্রামণ, বাহুযুগল দ্বারা তাড়ন, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ এবং অপসর্পণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন ও স্থাপন দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে চেষ্টা করিলেন।

এ দিকে এই যুদ্ধে অসদৃশ ব্যাপার দর্শন করিয়া অনেকেই দয়ার্দ্রচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, অহো! এই সমর অতি বিসদৃশ ব্যাপার। ইহা রাজ-সভাসদ্‌দিগের অতীব অধর্ম্ম। বালকের সহিত বলবান্ মল্লের যুদ্ধ দেখিয়া কোথা রাজা নিবারণ করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি নিজেই আবার অনুমোদন করিতেছেন! শৈলরাজ সদৃশ এই দুই মল্লের প্রকাণ্ড দেহ

বজ্রের ন্যায় সারবান, আর এই দুই সুকুমার-কলেবর বালক এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই, এখনও ইহাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাদের পরস্পর যুদ্ধ কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যে স্থানে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় সে স্থানে কখনও অবস্থিতি করিতে নাই; সভা স্থলে যিনি জানিয়াও নীরব থাকেন কিম্বা স্বার্থপরবশ হইয়া বিপরীত বলেন তিনি নিশ্চয়ই দোষী হন। ইহা স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ স্থানে প্রবেশ করা উচিত নহে। অন্যদিকে মঞ্চোপরি অবস্থিত নন্দাদি গোপগণ এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

অনন্তর কেশব বাহু যুদ্ধের বিশেষ বিধি অনুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে এরূপ ভীম বেগে আক্রমণ করিলেন যে চানুর তাহা সহ্য করিতে পারিল না, তাহার জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট বাহু-প্রদেশ ধারণ পূর্ব্বক বারংবার ভ্রামিত করিয়া ভীষণ বলে ভূমিতলে আছাড় মারিলেন। সেই আঘাতেই ভ্রষ্ট কেশ, ভ্রষ্ট বেশ, ভ্রষ্ট দন্ত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। বল-ভদ্রের প্রচণ্ড প্রহারে—মুষ্টিকও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

ভোজরাজ কংস স্বীয় মল্লদ্বয়ের এতাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অবিলম্বে রামকৃষ্ণকে নগর হইতে দূরীকৃত করিয়া বাসুদেবকে নিহত ও নন্দগোপের সমস্ত সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিতে আদেশ দিল। দুরাত্মা কংসের আদেশ বাক্য শ্রবণ

করিয়া অত্যাচারীর প্রতিবিধান মানসে অমিত পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কংসের মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন, কংস আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেও কেশবের বিক্রম সহ্য করিতে পারিল না। বিপুল তেজস্বী হৃষিকেশ কংসের অসি প্রয়োগের পূর্ব্বেই তাহাকে ক্ষিপ্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ বেগে উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমির উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বয়ংও সেই সঙ্গে সিংহ বিক্রমে তাহার উপর নিপতিত হইলেন। তখন অসুররাজ কংস মর্দ্দন বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল; এত দিনে দুরাত্মা কংস পাপের প্রতিফল পাইল বলিয়া সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ কংস কারাগারে গমন পূর্ব্বক পিতা মাতাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন এবং মস্তক দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দনা করিলেন। এত দিনের পর বসুদেবের যজ্ঞ ফল পূর্ণ হইল, অত্যাচারী কংসের দৌরাত্ম্য লোপ পাইল, "জগতে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতন" রূপ মহামন্ত্রের অঙ্কুর দেখা দিল, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবার বীজ বপিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন।

রাজ্যচ্যুত উগ্রসেনই মথুরার সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বসুদেব লৌকিক প্রথানুসারে পুরোহিত গর্গাচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা রামকৃষ্ণের যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতাসহ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণে অভিলাষী হইলেন। এদিকে নন্দাদি গোপগণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পিতঃ আপনারা স্নেহপূর্ণ হইয়া আপন অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিকতর যত্নসহকারে পালন করিয়াছেন। পোষণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদিগকে যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা পিতা মাতা। পিতঃ! এক্ষণে আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরা যথাসময়ে পুনরায় আপনাদিগের চরণ বন্দনা করিব। নন্দ স্নেহ-বিহ্বল হৃদয়ে রাম-কৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে গোপগণের সহিত ব্রজে যাত্রা করিলেন।

রাম-কৃষ্ণের বিদ্যা শিক্ষা।

অবন্তিপুর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রজ সান্দীপনী মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য রাম-কৃষ্ণ উভয়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে গুরু-গৃহে চৌষট্টি বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভা, অলৌকিক গুরুভক্তি, অপূর্ব্ব স্বভাব-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন। চতুঃষষ্টি অহোরাত্রের মধ্যে তাঁহারা সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। কি ধনুর্ব্বেদ, কি ধর্ম্ম নীতি, কি আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, কি রাজনীতিশাস্ত্র কোন বিষয়েই কেহই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিল না। অবশেষে গুরুদেব তাঁহাদিগকে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী দেখিয়া যথাবিহিত

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অধ্যাপনা শেষ করিলেন। তখন তাঁহারা গুরু দক্ষিণা প্রদানে অভিলাষ জানাইলে মহামুনি সন্দীপনী তাঁহাদিগকে স্বীয় পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গুরু-পত্নী সাগর-তীরে একটি পুত্ররত্ন হারাইয়া পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান করিতে ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার মন সেই পুত্রের মুখ ভুলিতে পারে নাই। পরিশেষে রাম-কৃষ্ণকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের ভক্তি গুণে আবদ্ধ হইয়া পুত্রশোক কতক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাম-কৃষ্ণ বিদ্যা শিক্ষা সমাপনানন্তর বিদায় লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার পুত্রশোকানল দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে যখন তাঁহারা দক্ষিণা প্রদানের কথা উল্লেখ করিলেন, তখন সন্দীপনী গৃহিণী আর কিছুর উল্লেখ না করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেই সাগরকূলে অপহৃত সন্তানের কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গুরু-পত্নীর এতাদৃশ কাতরতা দেখিয়া পুত্রের অপহরণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত বর্ণন করিলে অসামান্য বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের মনে এক অপূর্ব্ব চিন্তা উদিত হইল, তিনি সেই অপহৃত ও মৃত-বিবেচিত সন্তানকে মাতার সমীপে আনিয়া দিবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং সম্ভবতঃ আনিয়া দিতে পারিবেন এরূপ কথাও জানাইলেন। গুরু-পত্নী অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়া এক দৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন বৎস! যদি তোমরা আমার সন্তানকে আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর প্রিয় দক্ষিণা জগতে আর কিছুই নাই।

অনন্তর রাম-কৃষ্ণ গুরু-পত্নীর প্রার্থনামত গুরু দক্ষিণা আনয়নের জন্য শীঘ্রই সাগরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া জল-দস্যুদিগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, সমুদ্র-মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জল দস্যুদিগের আবাস স্থান। ইহা অবগত হইয়াই নির্ভয়হৃদয় অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বীপে সমাগত হইলেন। যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া দস্যুরাজ কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে সন্দীপিনী মুনি-পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন যে প্রকাণ্ডাকার এক সামুদ্রিক শঙ্খ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া এই বালক সমুদ্র-জলে নিমগ্নপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময় আমরা ইহাকে লইয়া এই দ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলাম। আপনি মহাতেজস্বী যদুবংশের কুলতিলক, আপনার আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং যখন অধীনের নিকট সমাগত হইয়াছেন তখন আমার অদেয় আর কি আছে?

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্র সহ সাগরগর্ভস্থ দ্বীপ খণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় সেইরূপ একটী শঙ্খ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সেই শঙ্খ হইতে এরূপ সুগম্ভীর ধ্বনি বিনির্গত হইত যে পঞ্চজন অসুরেও ঘোরনাদ করিলে তাহার গম্ভীর নির্ঘোষ ঢাকিতে পারা যাইত না। শ্রীকৃষ্ণের এই শঙ্খ ধ্বনিই পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ নামে বিখ্যাত।

রাম-কৃষ্ণ গুরুপুত্রকে লইয়া যথাসময়ে অবন্তীনগরে গুরুপত্নী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে স্বশরীরে সমাগত দেখিয়াও মাতা তাহার সত্ত্বা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে পুত্র বহুকাল পূর্ব্বে মৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সে কিরূপে পুনরায়

স্বশরীরে মর্ত্যধামে বিরাজ করিতে পারে? গুরুপত্নীর মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি ইহা স্বপ্ন, অলীক মায়া বা সত্য ঘটনা কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র বিস্ময়স্তিমিতলোচনে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। স্বয়ং সন্দীপনী মুনিও স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া অবাক্-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারও মুখ দিয়া কোন বাক্য নির্গত হইল না।

অনন্তর রাম-কৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে পর তাঁহারা বহু চেষ্টায় আত্ম সংবরণ করিয়া রাম-কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ-বচনে ধন্যবাদ দানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আনন্দাশ্রুবেগে তাঁহাদের বাক্যরোধ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আনন্দগদ্গদ-স্বরে গুরুদেব বলিলেন বৎস! সংসারে ইহাপেক্ষা প্রিয়তর গুরু-দক্ষিণা আর কি হইতে পারে? এক্ষণে আমাদের কামনা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের গুরু পদবীতে সমাসীন, তাহাদের আর কোন্ অভিলাষ অবশিষ্ট থাকে? বৎস! এক্ষণে তোমরা সমস্ত শিক্ষায় পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া সমস্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

অবশেষে রাম-কৃষ্ণ গুরু-গৃহে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ পুরে প্রত্যাগত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

—ঃ*ঃ—

জরাসন্ধাদির আক্রমণ।

কংস নিহত হইবার পর অস্তি ও প্রাপ্তি নামক তদীয় পত্নী-দ্বয় স্বামী শোকে অধীর হইয়া পিতৃবাসে গমন করিল। মগধাধিপতি প্রবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধই তাহাদিগের পিতা। কংসই জরাসন্ধ-তনয়া-দ্বয়কে বিবাহ করিয়া তাহার জামাতৃ-পদে বরিত হইয়াছিল। এক্ষণে জরাসন্ধ দুহিতাদিগের মুখে তাহাদিগের পতি-হন্তা কৃষ্ণের কথা অবগত হইয়া জামাতৃ-বিঘাতক কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্য মহতী সেনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মগধেশ্বর ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক রূপে সমাগত হইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী, অমিত পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সমভিব্যাহারে অল্পমাত্র সৈন্য পরিবৃত হইয়া নগরী হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক ভীষণ বেগে জরাসন্ধ রাজকে আক্রমণ করিলেন। জনার্দ্দন যুদ্ধ কৌশলে এরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, জরাসন্ধের সৈন্যের তুলনায় যাদব সৈন্য সামান্য মাত্র হইলেও সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া মগধাধিপতিকে নগরাবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন। জরাসন্ধ মথুরা-বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া রণস্থল হইতে স্বরাজ্যাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন।

স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াও শৌর্য্যশালী জরাসন্ধের মন হইতে যাদবকুল বিনাশের বাসনা লোপ পাইল না। বিশেষতঃ যখনই বিধবা কন্যাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন তখনই তাহার হৃদয় বৈরনির্য্যাতনের জন্য ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। সুতরাং তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, কিছুকাল পরে পুনরায় মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন। সেবারও বলরাম সমভিব্যাহারী শ্রীকৃষ্ণের বীরদর্পে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। মগধ-দেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ এইরূপ সপ্তদশবার মথুরাপুরী আক্রমণ করিলেন এবং প্রতিবারেই শ্রীকৃষ্ণের কৌশল-চক্রে এবং তাঁহার অসম সাহসিকতাময় অতুল তেজপ্রভাবে পরাস্ত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন।

এদিকে বীর্য্যমদোন্মত্ত ম্লেচ্ছাধিপতি কালযবন মথুরাপুরীর শোভা-সৌন্দর্য্য ও অতুল বিভবের কথা অবগত হইয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য অসংখ্য ম্লেচ্ছ সৈন্য সহ আসিয়া সমবেত হইল। তাহার সেনাদলে হস্তী, অশ্ব রথ, পদাতিক কিছুরই অভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ এহেন অগণিত সৈন্য সামন্ত সহ সমাগত কালযবনকে রণস্থলে সৈন্য সামন্ত দ্বারা পরাজিত করিতে হইলে যাদবসেনা সংখ্যা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়া যাদবদিগকে সৈন্য সামন্ত সহ পুর রক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়া স্বয়ং কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র প্রবলবেগে তৎপ্রতি ধাবমান হইল। শ্রীকৃষ্ণও পলায়ন ছলে তাহাকে ক্রমশঃ দূরে লইয়া এক গিরি-সঙ্কটপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কাল যবন সৈন্যদল হইতে অনেক দূরে আসিয়াছে দেখিয়া মহাবলশালী জনার্দ্দন তাহাকে ভীষণবেগে

আক্রমণ করিলেন। অপরিমিত বীর্য্যশালী কেশবের সেই ভীম-পরাক্রম কালযবন সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাদনুবর্ত্তন করিতে করিতে গিরি গুহা মধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ কবিল।

কথিত আছে, যুবনাশ্ব নন্দন মান্ধাতার পুত্র মুচুকন্দ সেই গিরি-গহ্বরে যোগাসনে বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতেছিলেন; কাল-যবন শ্রীকৃষ্ণকে গিরি গুহার মধ্যে অন্তর্হিত দেখিয়া তাঁহার অনু-সন্ধানে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং যোগাসনোপবিষ্ট মুচুকন্দকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। মুচুকন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন তাঁহার যোগলব্ধ তেজ প্রভাবে কালযবন ভস্মীভূত হইল।

যাহাহউক শ্রীকৃষ্ণের কৌশলচক্রে কালযবন নিহত হইলে তদীয় সৈন্যসামন্তগণ পলায়ন করিলে পশ্চাদ্ধাবিত যদুবীরগণের হস্তে নিহত হইতে হইবে ভাবিয়া যদুকুলের বশ্যতা স্বীকার করিল। যাদবগণ এইরূপে অনেক সৈন্য সামন্ত, হয়, হস্তী রথ লাভ করিয়া সৈন্য-দলের পুষ্টি সাধন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন যে, কালযবনের আক্রমণ সংবাদ জরাসন্ধ সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র সে দুরাত্মা পুনরায় মথুরাপুরী আক্রমণ করিতে আসিবে। এই-রূপে বারংবার আক্রান্ত হইলে অনেক সৈন্য বৃথা নষ্ট হইবে এবং অনর্থক যদুবীরদিগকে বারংবার কষ্ট পাইতে হইবে। এতএব কোন উপযুক্ত স্থানে এমন সুদৃঢ় দুর্গ চক্র এরূপ কৌশল ক্রমে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে কেহই আর যাদবদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদিও কেহ মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে যদুবীরগণ ত দূরের কথা যদু স্ত্রীগণও তথা হইতে যুদ্ধ পরিচালন করিয়া বিজয়শ্রী লাভ

করিতে পারিবে। বিশেষতঃ আমরা সুপ্ত, প্রবাসগত বা যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকি না কেন যাহাতে অন্য দেশীয় দুষ্টবুদ্ধি যোদ্ধাগণ কোন কালেই যদুবংশীয়দিগকে পরাভব করিতে না পারে এরূপ উপায় বিধান করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদুপযোগী স্থানান্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সমুদ্র সমীপে রৈবতক পর্ব্বতে সেইরূপ স্থান মনোনীত করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও পুরী স্থাপনে যত্নবান হইলেন।



দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা।

সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ নিরাপদ পুরী স্থাপনের জন্য রৈবতক পর্ব্বত মনোনীত করিয়া তথায় দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। তাহার প্রাচীর পরিখাদি, তাহার অস্ত্রক্ষেপণের সুন্দর গবাক্ষ-ভেদ, প্রতিপক্ষের অস্ত্রপ্রতিরোধের কৌশলময় দ্বার-বন্ধনী, শক্রর প্রবল আক্রমণ নিবারণের অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর-ব্যূহ প্রভৃতি অজেয় দুর্গনির্ম্মাণ বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ অপূর্ব্ব বিজয়প্রাসাদ গিরিশৃঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্গকে নগর প্রবেশের দ্বার স্বরূপ রাখিয়া সুন্দর পুরী স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। যথাসময়ে দ্বারকানগরী বিনির্ম্মিত হইলে যদুবংশীয়গণ সপরিবারে—মথুরাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দ্বারকা ধামে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সেখানে পরম রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা, অত্যুন্নত শৈলশৃঙ্গ, তদুপরি অভ্রভেদী গিরিদুর্গ এবং অপরূপ কারুকার্য্য-সমন্বিত অট্টালিকাসকল অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ফলতঃ অলৌকিক ক্ষমতাশালী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ কার্য্যকুশলতাগুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই দ্বারকাপুরী সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সামতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু, কুন্তি এবং অন্ধক

ও ভোজবংশীয় নৃপতিগণও জরাসন্ধের উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া এই অভেদ্য নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইলেন।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে দ্বারকার সিংহাসনে অধিরূঢ় রাখিয়া নিজে রাজ্য ও সমাজ পবিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য্য ও বুদ্ধিবিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, কাজেই তাঁহাকে যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ অবস্থান করিতে হইল। কৃষ্ণ হইতেই সর্ব্বদা যাদবকুলের বিপদ আপদ দূরীভূত ও রক্ষাবিধান সংসাধিত হইত; সুতরাং বলরাম, কৃত-বর্ম্মা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠগণও যখন যাহা করিতে অভিলাষ করি-তেন তাহা শ্রীকৃষ্ণকে না জানাইয়া কখনই তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইতেন না। কৃষ্ণ সকলকে না দিয়া কখন কোনরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগে ইচ্ছা প্রকাশও করিতেন না। ফলতঃ সকলের হিতসাধন করিবার জন্যই যেন তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই ভাবই সকলের মনে অঙ্কিত হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ।

বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজ স্বীয় দুহিতা রুক্মিণীর বিবাহযোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিতে অভিলাষী হইলেন। নানা দিগ্দেশ হইতে রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বর সভায় সমাগত হইলে ভীষ্মকরাজ তাঁহাদিগকে যথা-যোগ্য সমাদর পূর্ব্বক আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ, বলদেব এবং যদুবীরগণও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

মগধাধিপতি জরাসন্ধ, শিশুপালের সহিত যাহাতে রুক্মিণীর বিবাহ-ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী জরাসন্ধের অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া পিতাকে এই কথা জ্ঞাপন করাইলেন। মহামতি ভীষ্মক বলিলেন যে, আমার কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে বলিয়া রাজগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনা হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে যদি তাহা না করিয়া কন্যাকে চেদিপতির হস্তে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে অপরাপর রাজগণকে একপ্রকার অপমানিত করা হয়—সুতরাং সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে আমার অভিলাষ নাই।

এদিকে অসামান্য গুণবতী ভীষ্মক-দুহিতা সমাগত রাজন্যবৃন্দের একে২ পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন; বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্য, দয়াদাক্ষিণ্য, বুদ্ধিবিক্রম সমস্তই ইতিপূর্ব্বে কতক শ্রবণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া এবং শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব রূপজ্যোতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। এই অনুরাগের কথা সখীমুখ-ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গোচর হয়। তিনিও অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না বিদর্ভরাজ দুহিতাকে দর্শন করিয়া—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।

বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক স্বীয় কন্যার মনোভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগ্রামের কথা পূর্ব্ব হইতেই বিদিত থাকায় যাহাতে স্বয়ম্বর স্থলে বাসুদেবকেই জামাতৃরূপে লাভ করিতে পারেন সেইরূপ অভিলাষ পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যৌবন-মদগর্ব্বিত রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষী রাজন্য বর্গের পরামর্শ ক্রমে এবং তাহাদের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ থাকায় স্বীয়

ভগিনীকে শিশুপাল হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্য পিতাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ মগধাধিপতি জরাসন্ধ তখন রাজচক্রবর্ত্তীরূপে অধিষ্ঠিত; তিনি জামাতৃ-হন্তা শ্রীকৃষ্ণকে এই বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দিতেই সম্মত ছিলেন না। এখন শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কোন মতেই রুক্মিণীকে লাভ করিতে না পারেন তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনিও ভীষ্মক রাজকে শিশুপাল হস্তে কন্যা সম্প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। সাম্রাজ্যাধিপতি জরাসন্ধের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে ভীষ্মকরাজের সাহস হইল না, অধিকন্তু যখন জ্যেষ্ঠ পুত্রও বারংবার সেই সম্বন্ধের জন্য আগ্রহাতিশয্য দেখাইতেছে তখন শিশুপালকেই দুহিতৃ-সমর্পণে সম্মত হইলেন। কন্যা স্বয়ম্বরা না হইয়া চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে সমর্পিত হইবে এই কথাই ধার্য্য হইল এবং তদনুরূপ আয়োজন চলিতে লাগিল।

চেদিপতি দমঘোষ-তনয় শিশুপালের অভ্যুদয়োচিত কার্য্য সমূহ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইল এবং তাঁহাকেই কন্যা-রত্ন প্রদত্ত হইবে এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এই সংবাদ-শ্রবণে কৃষ্ণপক্ষপাতিনী রুক্মিণীর মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল। তিনি মনে মনে যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের গলে মাল্যার্পণ করিবেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। সুখের বিবাহ তাঁহার নিকট দুঃখের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যদুবীরগণ কন্যা স্বয়ম্বরা না হইয়া শিশুপাল হস্তে সমর্পিত হইবেন শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, বিদর্ভপতি আমাদিগকে স্বয়ম্বর স্থলে আহ্বান করিয়া এক্ষণে প্রত্যাখ্যান

করিতেছেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ কন্যা অপরের প্রতি অনুরাগিণী হইলেও এবং পিতা কন্যার স্বয়ম্বরে প্রতিশ্রুত থাকিলেও এক্ষণে অন্যান্য রাজন্যবর্গকে ঘোরতর অবমাননা করিয়া ভীষ্মক চেদিপতি-তনয়কে অর্পণ করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে যদ্যপি আমরা এরূপ অপমানিত হইয়াও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের আর কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। অধিকন্তু যে কুমারী যাহার উপর অনুরাগিণী হইয়াছে এবং যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে সে কুমারীকে যদ্যপি কেহ সেই পাত্রের গলে বরমাল্য দিতে বাধা দেয় তাহা হইলে ধর্ম্মত সেই লোক পাপভাগী হয়। সুতরাং এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কন্যাকে রক্ষা করাও আমাদের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-দুহিতাকে উদ্ধার করিবার উপায় নিরূপণ করিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের উপযোগী আর কোন পন্থা পাইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শুভ বিবাহের পূর্ব্ব দিনে কন্যা সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অম্বিকার মন্দিরে যাত্রার জন্য উদ্যোগ করিলেন। নববেশ পরিধৃতা রুক্মিণী বর্ম্মাচ্ছাদিত-কলেবর উদ্যতাস্ত্র রাজ-সৈনিকগণে পরিরক্ষিতা ও সখীগণে পরিবৃতা হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত ভবানীর পদপল্লব সন্দর্শন করিবারি জন্য পদসঞ্চারে বহির্গত হইলেন। অমনি মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুরী ও ভেরী বাজিয়া উঠিল। কুলস্ত্রীগণ দেবোপহার ও পূজোপকরণ এবং সালঙ্কৃতা

ব্রাহ্মণপত্নীগণ মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও আভরণ লইয়া বধূকে বেষ্টন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

রাজনন্দিনী দেবী-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে ও শান্তভাবে অম্বিকার সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। বিপ্রপত্নীগণ রাজবালাকে ভব-ভবানীর পূজা করাইলেন। কুমারী একে একে জল, চন্দন, আতপ-তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, মাল্য ভূষণ ও দীপশ্রেণী প্রভৃতি পূজার সামগ্রী নিবেদন করিয়া ভবানীপদ অর্চ্চনা করিলেন এবং মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীস্বরূপে পাইবার জন্য দেবীসমীপে কামনা করিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মৌনব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ রত্ন শোভিত হস্ত দ্বারা সখীকে ধারণ করিয়া অম্বিকার মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন এবং ধীর পদ সঞ্চারে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

এদিকে অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণ রথ সুসজ্জিত রাখিয়া কন্যার প্রত্যাগমন কালের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে ভীষ্মক-দুহিতাকে যথাস্থানে সমাগতা দেখিয়া সিংহপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ যূথমধ্যে নিপতিত মৃগরাজের ন্যায় রাজকন্যার শরীররক্ষক মুষ্টিমেয় সৈনিকদিগকে ক্ষণকাল মধ্যে বিমর্দ্দিত করিয়া রুক্মিণীকে বিদ্যুৎ-বেগে নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং দ্রুত-গতিতে স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। বলদেব-প্রমুখ যদুবংশীয় বীরগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন।

জরাসন্ধাদি বীরগণ স্বয়ম্বর স্থলে সমাগত যদুবংশীয়দিগের দ্বারা এই সাম্প্রদানিক বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে ভাবিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। এক্ষণে এই কন্যা-হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র

তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অসাধারণ বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক শিক্ষা প্রভাবে সকলের অস্ত্রজাল ব্যর্থ করণ পূর্ব্বক স্বীয় গমন পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে বলরাম-প্রমুখ যাদববীরগণ আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন আক্রমণকারী নৃপতিবৃন্দ আর জয় লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া অগত্যা পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিত্যাগে বাধ্য হইল।

এথায় রাজপুরী মধ্যে যুবরাজ রুক্মী ভগিনীর হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ক্রোধকম্পিতস্বরে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কৃষ্ণকে সংহার এবং অনুজাকে উদ্ধার না করিয়া আমি আর কুণ্ডিনে প্রত্যাগমন করিব না। এইরূপ সত্য করিয়া কোপনস্বভাব রুক্মী কবচ পরিধান ও ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া অক্ষৌহিনী সেনা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণানুসরণে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য নৃপতিগণ শ্রীকৃষ্ণ সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিবার পরেই রুক্মী যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার মরণ-কণ্ডুয়ন দেখিয়া ক্ষিপ্র হস্তে বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক ভীষ্মক-কুমারের ধনুচ্ছেদন, রথধ্বজ ভঙ্গ এবং অশ্বসহ সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রুক্মী অন্য ধনু গ্রহণ করিতে না করিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা পুনরায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে রুক্মী উপায়ান্তর না দেখিয়া করবাল গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে রথ হইতে অবতীর্ণ দেখিয়া তরবারি হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অমিতপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণের তেজ মদোন্মত্ত যুবা কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অতি

অল্পক্ষণ মধ্যেই রুক্মী কেশবের আয়ত্বাধীন হইয়া পড়িলেন, তিনি বৃথা প্রাণী হননে কোন কালেই সম্মত নহেন, সুতরাং পরাজিত রুক্মীকে রণস্থলে পরিত্যাগ করিলেন। রুক্মী পরাভূত হইয়া ও শত্রুর দয়ার পাত্র স্বরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া ঘোরতর অপমান বোধে লজ্জাবনত মুখে প্রস্থান করিলেন। এবং আপনার সত্য রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা 'ভোজকট' নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

বিক্রমকেশরী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সকলকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মকনন্দিনীকে দ্বারকাপুরীতে আনয়ন করিলেন। সেখানে যথাবিহিত বিধানানুসারে পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল, যদুপুর-বাসীদিগের গৃহে মহামহোৎসব চলিতে লাগিল। দ্বারকানগরী ইন্দ্রধ্বজ, বিচিত্রমালা, বস্ত্র ও কারুকার্য্যময় অপূর্ব্ব তোরণসমূহে সুসজ্জিত হইল। লাজ, দূর্ব্বা, পুষ্প ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ ও দীপ সকল শুভ বিবাহোৎসবের মঙ্গল-চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে নৃপতি-বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিল।

যথাবিধি উদ্বাহব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নরনারীগণ সুসজ্জিত মণিকুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া বিচিত্র বসন-পরিবৃত বরকন্যাকে যৌতুক দিবার জন্য বিবিধ উপহার সামগ্রী আনয়ন করিতে লাগিলেন। বরকন্যা ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের আশীর্ব্বাদলাভ ও বয়োকনিষ্ঠদিগের অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ-বাসর অতিবাহিত করিলেন। বিদ্যুৎবরণী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী পদ্মপলাশলোচন নীরদবরণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত

হইলে বোধ হইল যেন নবীন মেঘের ক্রোড়ে চপলা সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছে; যে কেহ সেই যুগলমূর্ত্তির অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তিনিই বিমুগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে আপনি ভুলিয়া অতুল সৌন্দর্যের অমৃতধারা পান করিতে করিতে স্বর্গসুখভোগের অধিকারী হইলেন।

ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যথাসুখে দাম্পত্য লীলা বিস্তার করিলেন। রুক্মিণী প্রেমময় পতি-রত্ন লাভ করিয়া অনন্যচিত্তে তাঁহারই ভজনা করিতে লাগিলেন। স্বামীই রমণীর একমাত্র গতি ভাবিয়া তাঁহারই প্রীতি-কামনায় সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকিতেন এবং পতিসোহাগই ভার্য্যার সৌভাগ্য জানিয়া তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত কায়মনবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার বল্লভরূপে বিরাজমান থাকিয়া সংসারে দাম্পত্য বিধির আদর্শ স্থাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী ব্যতীত আরও আট জন প্রধানা মহিষী ছিলেন যথা; সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামা, জাম্ববান্ তনয়া জাম্ববতী, নগ্নজিৎ কন্যা সত্যা, কালিন্দী, বৃহৎসেন কুমারী মিত্রবিন্দা, কামরূপিনী ভদ্রা, মদ্ররাজসুতা সুশীলা এবং লক্ষ্মণা। এই সকল কন্যাগণ স্ব, স্ব বিবাহ বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাও ভাগবতে লিখিত আছে, পাঠকগণের জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"সত্যভামা কহিলেন, ভ্রাতা প্রসেনের নিধন হেতু মদীয় পিতা অত্যন্ত সন্তপ্ত ছিলেন। সকলেই কেশবকে নিধনকর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহার অপযশ কীর্ত্তন করিতেন। হৃষিকেশ স্বীয় অপযশ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত ভল্লুক-রাজকে পরাস্ত করিয়া স্যমন্তক

মণি আনিয়া দেন। তাহাতে আমার পিতা অন্যায় অপবাদ কীর্ত্তনরূপ অপরাধে ভীত হইয়া ইহার হস্তে আমাকে অর্পণ করেন।

জাম্ববতী কহিলেন, পিতা জাম্ববান্ ইহার মহিমা না জানিয়া ক্রোধভরে ইহার সহিত সপ্তবিংশতি দিবস যুদ্ধ করেন। পরে ইহাঁর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক মণির সহিত আমাকে লইয়া উপহার স্বরূপে প্রদান করেন। তাহাতেই আমি ইহার দাসী হইয়াছি।

কালিন্দী কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শের অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছিলাম, ইনি তাহা অবগত হইয়া নিজের উদারতা-গুণে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তদবধি আমি তাঁহার গৃহ-মার্জ্জনকারিণী দাসী হইয়াছি।

ভদ্রা কহিলেন, শ্রীনিবাস স্বয়ং স্বয়ম্বর স্থলে আসিয়া রাজন্য-বর্গকে এবং অপকারকরণে প্রবৃত্ত আমার ভ্রাতাদিগকে জয় করিয়া আমাকে নিজপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। জন্মে জন্মে যেন আমি তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকি।

সত্যা কহিলেন, আমার পিতা নৃপতিবৃন্দের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতি বীর্য্যবান সাতটি বৃষভ পালন করিয়াছিলেন। যিনি এই সাতটি তেজস্বী বৃষকে পরাজিত করিতে পারিবেন তিনিই আমাকে লাভ করিবেন এইরূপ ঘোষিত হইলে, শিশু সকল যেমন ছাগ-শাবকদিগকে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণ তেমনি বীরগণের দুর্ম্মদনাশক সেই বৃষ সকলকে অবলীলাক্রমে বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া আইসেন। আমি যেন চিরকালের জন্য তাঁহার দাসী থাকিতে পাই।

মিত্রবিন্দা কহিলেন, আমাকে বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া পিতা স্বয়ং ইহাঁকে দান করেন। আমি বিবিধ কর্ম্মবশতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতেছি, অতএব জন্মে জন্মে যেন আমার ভাগ্যে ইহাঁর পাদসংস্পর্শ ঘটে, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।

লক্ষ্মণা কহিলেন, আমি পিতৃরাজ্যে সমাগত মহর্ষি মুখে বারম্বার অচ্যুতের গুণগান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত অন্যান্য লোকপাল-দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুকুন্দে আসক্ত হয়, তাঁহার দাসী হইবার জন্য আমি অতীব উৎসুক্য প্রদর্শন করি। দুহিতৃবৎসল পিতা বৃহৎসেন আমার মত জানিতে পারিয়া লক্ষ্যভেদ স্বয়ম্বর করিলেন। নিম্নে দৃষ্টি রাখিয়া সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। নানা দিগেদশাগত রাজন্যবর্গ লক্ষ্যভেদ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন। কেহ ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ বা প্রায় কোটি পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ধনু দ্বারাই আহত হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপে প্রায় সকলেই অকৃতকার্য্য হইলে অবশেষে হৃষিকেশ সেই ধনু গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ করিলেন এবং তাহাতে বাণ যোজনা পূর্ব্বক নিম্ন দৃষ্টিতে নিম্নস্থিত জলে মৎস্যরূপ লক্ষ্যকে দেখিয়া বাণ দ্বারা উহা ছেদন ও পাতিত করিলেন। অমনি জয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, আনন্দ কোলাহলে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন আমি নূতন পট্টবস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল রত্নমালা ধারণ পূর্ব্বক মধুর নূপুর-ধ্বনি-সহকৃত পদ সঞ্চালনে সেই সভায় প্রবেশ করিলাম। আমার কবরীতে মাল্য এবং বদনে লজ্জা সহকৃত হাস্য শোভা পাইতেছিল; গণ্ডস্থল, কুন্তল-

কান্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আমি মুখ উত্তোলন করিয়া সলজ্জ কটাক্ষ বিলোকনে চতুর্দ্দিকে অল্পে অল্পে রাজাদিগকে দর্শন করিতে করিতে মুরারির স্কন্ধে বরমাল্য অর্পণ করিলাম। অমনই মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল, নট নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, গায়কেরা গাহিতে লাগিল। পিতা নানাবিধ রত্ন অলঙ্কার অস্ত্র শস্ত্র দাস দাসীসহ আমাকে কেশবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি আমাকে স্বীয় রথোপরি আরোহণ করাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে আমরা সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী কুশস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই অবধি আমি সর্ব্বসঙ্গ হইতে নিবৃত্তি এবং স্বধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা সেই আত্মারামের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি।

অন্যান্য কৃষ্ণরমণীগণ বলিলেন, যে মহাবল ভৌম কর্ত্তৃক আমরা পিতৃগণসহ কারাগারে আবদ্ধ হইলে জনার্দ্দন ভৌমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মের অভিলাষিণী জানিয়া স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে অবজ্ঞা করিলেন না। আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মপদ, মোক্ষ কিছুই চাহি না, কেবল তাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাই চিরকাল বহন করিতে বাসনা করি। তিনি যখন নদী পুলিনে গোচারণ করিতেন তখন ব্রজাঙ্গনাগণ যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিল তাঁহার সেই পাদস্পর্শই আমাদের একমাত্র অভিলাষ।”

পাঠক এই সকল কৃষ্ণ রমণীদিগের নিজের মুখের উক্তি শ্রবণ করিয়া আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, শ্রীকৃষ্ণ সংসার ধর্ম্ম

প্রতিপালনের জন্য প্রকৃতপক্ষে বহু বিবাহ দোষে দোষী ছিলেন কি না? জগতে প্রেম-ভক্তি শিখাইবার জন্য যেরূপ বৃন্দাবনে গোপীগণের হৃদয় ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বিধান সাধিত হইয়াছিল, দ্বারকাপুরীতে এই সকল রমণীগণও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজনাবলে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহার চরণ-রেণুর ভিখারিণী হইতে শিখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপ্তকামরূপে তাহাদের মধ্যে বিরাজ থাকিতেন। তবে বৃন্দাবনে গোপীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা ছিলেন তিনিই যেমন রাধা নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়াই যেরূপ রূপক ছলে অনেকে অনেকরূপ সংসার-লীলা বর্ণন করিয়া থাকেন, সেইরূপ অনেকে প্রকৃত তথ্য না বুঝিয়া দ্বারকাপুরীতেও সত্যভামাকে লইয়া রুক্মিণীর পার্শ্বে বসাইয়া সপত্নী-দৃষ্টি ছড়াইয়া অনেক লীলা খেলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ফলতঃ সংসারে পরিণীতা সহধর্ম্মিণী বলিলে মানব হৃদয়ে যে ভাব প্রতিফলিত হয়—ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিনী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের সেরূপ আর কোন অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন কি না পাঠকগণ আপনারাই তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম ছিলেন, জ্ঞানমার্গের উন্নতিস্বরূপ আত্মরতিতেই তিনি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেন। ষোড়শসহস্র দল-বিশিষ্ট হৃদ্‌পদ্মের মধ্যে অবস্থিত আত্মাতেই তিনি রত থাকিতেন, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হইতেন, আত্মাতেই মৈথুন করিতেন এবং তাহাতেই আনন্দ পাইতেন। এই ষোড়শসহস্র দল-বিশিষ্ট হৃদ্‌-পদ্মই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র রমণীরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণের রণবেশ।

বিদর্ভরাজ-দুহিতা রুক্মিনীর গর্ব্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু এবং চারু নামে দশটি পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী একটী কন্যা সমুৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকন্যাকলত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগতে কাল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছিল—দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ দুষ্টপ্রকৃতির দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক্ষণে সংসারে সেই সকল দুষ্টের দমন বিধান জন্য রণবেশে সজ্জিত হইলেন।

নরকাসুর বধ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুর প্রবল প্রতাপান্বিত মুরদিগের অধিপতি ছিলেন। মুরগণ যবন শ্রেণীর অন্তর্ভূত। তাহারা স্বভাবতই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। বিশেষতঃ ভারতের সমৃদ্ধিশালী নগরের দিকে তাহাদের অনবরতই লালস-দৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিত, যখনই সুবিধা পাইত তখনই তাহা লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এইরূপ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যাচার

নিবারণ জন্য সসৈন্যে তাহাদের রাজ্যে আসিয়া সমাগত হইলেন। দেখিলেন প্রায় দশ সহস্র মুর সৈন্য সেই রাজ্য রক্ষা করিতেছে। তাহাদের রাজপুরী, গিরিদুর্গ-অস্ত্রদুর্গ ও প্রাকারাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুদিগের দুর্ভেদ্যস্বরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুর সৈন্যগণের শারীরিক বল যেরূপ অধিক, অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনেও তাহারা সেইরূপ সুদক্ষ ছিল। সুতরাং এ হেন দুর্দ্দান্ত অসুরের শাস্তিবিধান জন্য শ্রীকৃষ্ণ যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি যদুবীরদিগকে ভীষণ পদাঘাতে গিরিদুর্গ, সুকৌশলবিনিক্ষিপ্ত বাণ প্রয়োগে শস্ত্রদুর্গ বিনষ্ট করিতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া চক্রাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মুরসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অব্যার্থসন্ধানে মুরদিগের সেনাপতির মস্তক ছেদিত হইলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃথা প্রাণীহিত্যা অপেক্ষা ঐরূপ উপায়েরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে এই প্রকার কার্য্য সাধন করিয়া ক্রমশঃই পুরীর মধ্যে অগ্রসর হইলেন। মহাতেজস্বী দুর্দ্দান্ত নরকাসুর এক প্রকাণ্ড গজে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখীন হইলে সে শ্রীকৃষ্ণকে একই আঘাতে বিনাশ করিবার জন্য তীক্ষ্মমুখ বিশাল শূল উত্তোলন করিল, কিন্তু তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মনোহর কুণ্ডলশোভিত মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদমনের চিহ্নস্বরূপ শত্রুর কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ

যখন সংবাদ পাইলেন যে দুরাত্মা নরক অপরের রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কুণ্ডলদ্বয় বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছিল; তখন দয়াময় বাসুদেব তাঁহাকে সেই কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া নরকাসুরের অত্যাচারের অবসান-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ বধ।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতিও 'বাসুদেব' নামে আখ্যাত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ দেখিয়া তাঁহার দ্বারকাপুরী, তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সমস্তই নিজের বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন এবং জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে এ সমস্ত আমাকে প্রত্যর্পণ না করিলে আমি শীঘ্রই তাহা পুনরধিকারকরণে প্রবৃত্ত হইব। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে অথবা সে সসৈন্যে আসিয়া সংগ্রামে আহ্বান করিলে বৃথা লোক ক্ষয় হইবে। অতএব এরূপ স্থলে আমি সৈন্য সামন্ত তাহার রাজ্যের সমীপে প্রস্তুত রাখিয়া স্বয়ং তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার যুদ্ধ-পিপাসা মিটাইয়া আসিব।

এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণ সহিত দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমস্ত সৈন্যসামন্ত পৌণ্ড্র-রাজপুরীর সীমাপ্রান্তে সুসজ্জিত রাখিয়া স্বয়ং তাহার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে উভয়েরই যখন একই সম্পত্তিতে দাবী করা হইতেছে তখন উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধই ইহা মীমাংসার একমাত্র উপায়। সেজন্য আমি আপনার

রাজ্যে সমাগত হইয়াছি, আপনি এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আপনার দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হউন।

বীরমদোন্মত্ত পৌণ্ড্রাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে সম্মত হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সিংহপরাক্রম কৃষ্ণের তেজ কতক্ষণ সহ্য করিতে পারেন? অসাধারণ শস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ কেশবের অস্ত্র চালন নৈপুণ্যে কতক্ষণ স্থির থাকিতে সমর্থ হন! শ্রীকৃষ্ণ অল্পকাল মধ্যেই শরজাল বিস্তৃত করিয়া তাহার রথধ্বজ ছেদন ও শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তখন পৌণ্ড্রেশ্বর অন্য ধনুগ্রহণে অবসর পাইতে না পাইতে শ্রীকৃষ্ণ সুতীক্ষ্ণ চক্রাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পরে স্বীয় সৈন্যদলের সহিত মিশিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কাশীরাজ দ্বৈরথ-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে স্বীয় সখা পৌণ্ড্রাধিপতি নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সসৈন্যে সমাগত হইয়া পথ মধ্যে বাসুদেবকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিপ্রহস্তে শর সন্ধান পূর্ব্বক কাশিরাজের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া বায়ুচালিত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় সুদূরে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। কাশীরাজপুত্র সুদক্ষিণ এবম্বিধ ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া যুদ্ধে বিমুখ হইলেন বটে, কিন্তু যাহাতে পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য অভিচার-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞকুণ্ডের ভয়ানক অগ্নিরাশি লোল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশঃ আপনার পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অপরের অমঙ্গলোদ্দেশ্যে সাধিত এই যজ্ঞ ফল নষ্ট করিতে আসিলে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং যজ্ঞকুণ্ডের অনল ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া কাশীধাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

শাল্ব বধ।

এই সৌভরাজ শাল্বের সহিত সংগ্রাম এবং 'প্রভাস মিলন' প্রভৃতি ব্যাপার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরাদির পর সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা এইখানেই তাহা শেষ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের ভারত-লীলা আরম্ভ করিব তাহাতেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরাদি বর্ণিত হইবে।

রুক্মিণীহরণ সময়ে এই শাল্বরাজ শিশুপালের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পথ রোধ করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অভিমানভরে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করে। সেই তপ প্রভাবে সৌভপতি শাল্ব সাতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং ব্যোমযান-ব্যবহার-বিদ্যা করায়ত্ত করিয়া লয়। পরে শাল্বরাজ পূর্ব্ব বৈরতা স্মরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিতে আসিল। দ্বারকাপুরীর গিরিদুর্গ সহজেই দুর্গম, সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে আবাব বিশেষরূপে সজ্জিত ও বীরগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়াতে একেবারেই দুরধিগম্য ও অনাক্রমণীয় হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহই সঙ্কেত মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট বা তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। সমুদায় নগরমার্গ সৈন্য বিভাগ দ্বারা ব্যাপ্ত ও শাল্বশিবিরে যাতায়াতের পথ সকল একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে শাল্ব ব্যোমযানারোহণে নগব মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ বহির্গমন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজের চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ কবিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিয়া অবশেষে শাম্ব শরে বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

শাল্ব রাজার সেনাপতি পলায়ন করিলে তাহার বেগবান নামক এক দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা শাম্বকে ভয়ঙ্কর বেগে আক্রমণ করিল। প্রভূত বলশালী শাম্ব সেই বেগ সহ্য করতঃ সত্বরে তাহার উপর এক বিশাল গদা নিক্ষেপ করিলেন। বেগবান্, মহাবীর শাম্বের গদাঘাতে একান্ত আহত ও নিতান্ত অভিভূত হইয়া বাতাহত জীর্ণমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর শাল্ব সেনা সমুদয় বিক্ষোভিত হইতেছে দেখিয়া স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। মহাবাহু প্রদ্যুম্ন যাদব যোদ্ধাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রু সমক্ষে গমন পূর্ব্বক এরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে শত্রুগণের প্রতি বাণ বর্ষণ ও শরাসনে শর সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, কেহই তাহার বেগ রোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বা গাত্র চালনা কিছুই লক্ষিত হইল না, কেবল তাঁহার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন শ্রবণে অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। মদমত্ত শাল্ব সৈন্যের অপচয় দেখিয়া ক্রোধভরে রুক্মিণী-নন্দনের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন উভয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রদ্যুম্ন সমর ক্ষেত্রে শাল্বের পরাক্রমে গুরুতর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বীরবরাগ্রগণ্য প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছাগত হইলে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও একান্ত ব্যথিত হইল। এদিকে শাল্ব দ্বারকাপুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞাবসানে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দ্বারকার ভগ্নশ্রী দর্শন করিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া ব্যোমযানচারী শাল্বের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শাল্ব নভোমণ্ডলস্থিত ব্যোমযানে আরূঢ় থাকায় তাহার বাণবর্ষণের অনেক সুবিধা হইতে লাগিল। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রক্ষিপ্ত শরনিকর ঊর্দ্ধমুখে প্রধাবিত হওয়ায় তাদৃশ তেজে আঘাত করিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক ক্রমশ শরজালে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। তখন অমোঘবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ বহুদূরগামী অগ্নিবাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ব্যোমযানের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কাজেই ব্যোমযান আর তত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না; ক্রমশঃ নিম্নস্তরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। বাসুদেবও ক্ষিপ্রহস্তে অবিশ্রান্ত শরজাল বর্ষণে সেই প্রকাণ্ড ব্যোমযান শতছিদ্র করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহা ঘুরিতে ঘুরিতে জলে আসিয়া নিপতিত হইল। বীরপরাক্রম শাল্বও লম্ফ প্রদানে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ গদা উত্তোলন পূর্ব্বক অচ্যুতের দিকে ভীমবেগে ধাবমান হইতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁহার সুদর্শন চক্র বিনিক্ষেপ দ্বারা শাল্বের কিরীটযুক্ত সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সৌভপতি শাল্বরাজ বিনষ্ট হইলে তদীয় সৈন্যগণ দ্বারকাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। দ্বারকাবাসীগণের উদ্বেগ দূর হইল, যাদবযোদ্ধাগণও রণবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রভাস-মিলন।

সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্য-গ্রহণ আগতপ্রায়। কল্পক্ষয়কালীন সেই দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তে মানব জন্মের মঙ্গল বিধান জন্য পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবার বাসনা জন্মিলে যদুবংশীয়গণ সপরিবারে তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদববীরগণের অনুপস্থিত কালের জন্য দ্বারকাপুরী রক্ষা বিধানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর কুরুক্ষেত্রে ইহাঁদের সমাগম হইলে সেই বার্ত্তা প্রচার হইবামাত্র মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল প্রভৃতি সুহৃদ ও আত্মীয় রাজগণ এবং অন্যান্য শত শত ভূপতি সমূহ প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনবাসী নন্দাদি গোপগণ, যশোদাদি গোপীবৃন্দ এবং রাধিকাদি গোপনন্দিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন বাসনায় তথায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ, যাহাদের সহিত মাঠে গরু চরাইয়া গোষ্ঠলীলায় দিনযাপন করিয়াছিলেন সেই সকল বাল্য-সখা শ্রীদাম, সুদামাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে আবার চক্ষের

সম্মুখে দেখিতে পাইব ভাবিয়া পরম প্রীতিরসে আপ্লুত হইলেন। গোপীগণ এত কাল ধরিয়া যাঁহার চরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন তাঁহাকে প্রাণভরিয়া পুনরায় দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিলেন। নন্দ যশোদা প্রাণের সন্তানকে পুনরায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে পাইবেন মনে করিয়া আশার উৎসাহে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন কি গাভী সকলও যেন এ উদ্যোগ বুঝিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পুনর্দ্দর্শন যেন হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার মনোহর বংশী রব পুনরায় যেন শুনিতে পাইব ভাবিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—স্থির দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। অবশেষে সকলে কৃষ্ণ দর্শন বাসনায় বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সমস্ত নৃপতিবৃন্দের সমাগমে কুরুক্ষেত্র মহাসমারোহ-পূর্ণ হইয়া উঠিল। পরস্পর সম্বন্ধানুযায়ী অভিবাদনাদি চলিতে লাগিল। যাদবেরা বৃদ্ধদিগকে বন্দনা ও কনিষ্ঠদিগকে প্রেমসম্ভাষণ ও স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডু-রাজমহিষী কুন্তী বসুদেবকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তোমাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা দুঃসময়ে উপেক্ষিত হইলাম। হায়! দৈব যাহার প্রতিকূল, সে স্বজন হইলেও সুহৃদ, জ্ঞাতি আত্মীয়, ভ্রাতা পুত্র পিতা মাতা কেহই তাহার সংবাদ লয় না, কেহই তাহাকে তাহার অসময়ে স্মরণ করে না। মহাত্মা বসুদেব স্বীয় ভগিনীর অসময়ে স্বামীবিয়োগ, জ্ঞাতিকুল কর্ত্তৃক উপদ্রুত এবং পরিশেষে সন্তান গুলিকে লইয়া

জতুগৃহ দাহ হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ লাভ পূর্ব্বক বনে বনে ভিখারিণীর ন্যায় অবিবাস প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন শুভে! ইহা আমাদের দোষ নহে; আমরা মানব, মানব দৈবের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। দৈববলেই আমরা কার্য্য করিয়া থাকি, অথবা দৈবই আমাদিগের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লয়। ভগিনী! আমরা দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া কারারুদ্ধরূপে অবস্থান করিতে ছিলাম, পরে তাহারই জন্য মৃত্যুর পরও আমরা মথুরায় অনেক অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। দৈব আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, পরিশেষে দৈবই আবার পুনরায় আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়া সকলের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে! অতএব দৈববশে যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, ধর্ম্ম পথে থাকিলে আবার ঈশ্বরকৃত দৈব বলেই তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর বৃন্দাবনবাসীগণ প্রভাসে সমাগত হইলে বসুদেব প্রিয়-সখা নন্দের কর ধারণ পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, সখে! আমরা সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যের দিকে চাহিয়া তাহাতে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা সংগ্রহের জন্য এতই ব্যস্ত থাকিতাম যে, তোমাদের ন্যায় অভিন্নহৃদয়ের মিত্রতা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সুখৈশ্বর্য্যলাভের ইচ্ছাই মনুষ্যকে ন্যায়পথ হইতে বিচলিত করিয়া থাকে। যাদবদিগের প্রাণস্বরূপ কৃষ্ণ, বলরাম অত্যন্ত দুঃসময়ে তোমাদেরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া, তোমাদেরই অন্নে পুষ্টিলাভ করিয়া, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে

দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছে। সুতরাং যাদবগণ শতজন্মেও তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বলিয়া মহাত্মা বসুদেব গাত্রোত্থান করিয়া নন্দরাজের দুই বাহু ধারণ-পূর্ব্বক প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের সখা-প্রেম উথলিয়া উঠিল, উভয়েরই নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার চরণ বন্দন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুখ দিয়া কোন বাক্য বিনির্গত হইল না। তিনি পিতৃমাতৃপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণিত হইলেন।

নন্দরাণী যশোদা কৃষ্ণ বলরামকে আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া স্নেহভরে তাঁহাদের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইলেন—কেবলমাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে স্নেহবারি বিনির্গত হইতে লাগিল।

পরে রোহিণী এবং দেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, ব্রজেশ্বরি! কোন্ কামিনী তোমাদিগের দুই জনের মিত্রতা ভুলিতে পারিবে? ইহা চিরজীবনের জন্য হৃদয় প্রস্তরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। তোমরা আমাদের রামকৃষ্ণের জন্য যাহা করিয়াছ ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিলেও আমরা তাহার প্রতিদানে সমর্থ হইতে পারি না। রাম কৃষ্ণ শৈশবে পিতামাতাকে কখনও দর্শন করে নাই, কিন্তু তোমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া পিতামাতার অভাবও কখন তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। তোমাদের সাধুজীবনে আত্মপর ভেদ নাই, এহেন সাধুহৃদয়ের প্রতিদান আমরা আর কি

করিতে পারি? তবে জগতে সাধুত্বের ফল একদিন অবশ্যই প্রতিভাত হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখাগণ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সমাগত হইবামাত্র বাসুদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে পরিতুষ্ট করিয়া অতীত বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনকাহিনী শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপটে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই গোষ্ঠবেশ সকলের চক্ষে যেন পুনরায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। সেই বনের মধ্যে বৃক্ষের ফল পাড়িয়া মুখে সুমিষ্ট বোধ হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ ব্যাপার যেন নূতনরূপে আবার তাহাদের মনে উঠিয়া কত কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সেই বাল্যসখা বৃন্দাবনবাসী গোপদিগকে তাহাদের সেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত যোগধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলে পর বাসুদেব তাহাদের প্রার্থনামতে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন;—

"ক্ষিত্যপতেজাদি মহাভূত সমূহ সৃষ্ট হইয়া তৎসমুদায় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবগণ সেই মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণীগণ ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ করিয়াছে। বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শব্দাদি জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে।

সারথী যেমন বশীভূত অশ্বসকলকে প্রেরণ করে সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীবগণের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভি-হিত হয়। ইন্দ্রিয় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণসমুদায় জীবের সৃষ্টি বিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষিগণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই যোড়শগুণপরিবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ পরিশূন্য। যোগীগণ পরমাত্মাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড়দেহে অব্যক্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত সমুদায়ে আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

পরমস্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য বা তির্য্যক স্থানে অব-লোকিত হন না; কিন্তু এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ;

তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অথচ স্থূল হইতেও স্থূল, তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়দেহে ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। আবার পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্বিংশতি পদার্থ সঞ্চিত, ক্ষয় সুখ দুঃখ বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনা সম্পন্ন শরীর মধ্যে জন্ম রহিত জীবাত্মাকেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া জানিবে। অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম ক্রোধ লোভ, ভয় ও মোহ এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবানদিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা শৌচ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি পাপ ধ্বংস, অভীষ্ট সংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহার-নিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে মন ও

ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়। যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে এবং মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধুম-বিহীন প্রজ্জ্বলিত অনল শিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

আবার যেরূপ গগন মধ্যে সূর্য্যের কিরণ জাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া যুক্তি দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ যে সমস্ত জীব স্থূল দেহ বিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ জল মধ্যে সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব দেহে প্রকাশিত লিঙ্গ শরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কি জাগ্রত অবস্থা, কি নিদ্রিতাবস্থা সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাঁহারাই লিঙ্গ শরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত গুণ সম্পন্ন হইয়াও জরা ম-পরাজয় পূর্ব্বক যথাসুখে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি

বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া থাকে। রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া জীবাত্মাকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক। মানবগণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্য বোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্ত দৃষ্টি ও অনন্ত শক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।"

"লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়াস-পাশে জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ফল লাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ, ভোগাভিলাষ উহার আলবাল; অজ্ঞানতা উহার মূল, প্রমাদ উহার সেকসলিল, অসূয়া উহার পত্র; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসা-লতা-সমূহ ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আয়াস-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন তিনি সুখ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। অকৃতী ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই ভোগ্য বিষয়ই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি ঐ বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানতারূপমূল যোগবলে সমাধি স্বরূপ অসি দ্বপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনই

কাম্য কর্ম্মের ফল বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন তাঁহাকে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যসখা গোপদিগকে এইরূপে যোগধর্ম্ম, ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মানব জীবনের সমুন্নত স্তর দেখাইয়া দিলেন, তখন জ্ঞান-মার্গের বিচিত্র সোপান তাহাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অবশেষে বাসুদেব পটমণ্ডপ মধ্যে একাকী প্রবেশ লাভ করিলে গোপীগণ তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা আপনাদের হৃদয় মধ্যে সেই গোষ্ঠবিহারী বংশীধারীর ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন এবং চক্ষের সম্মুখে সেই সর্ব্বজন-মনোহারী নীরদবরণধারী শ্যামসুন্দরের কমনীয়-কান্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রেম-ভক্তির প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, আনন্দ-প্রস্রবণের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া প্রেমাশ্রুরূপে শোভা পাইল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মুখ দিয়া কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইল না; তাঁহারা নয়ন ভরিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া সেই অনুপম মূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা এত দিন পর্য্যন্ত হৃদয়াভিরামের অদর্শন জনিত বিরহ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বলিলেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ! তোমরা বৃথা কেন আমাকে অভিযোগ করিতেছ, তোমাদের নিকট হইতে আমার অদর্শন কখন সম্ভবে না। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ যেমন সমস্ত পদার্থের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান আছে, আমিও সেইরূপ তোমাদের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছি। জীবাত্মা পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন শরীর মধ্যে কর্ম্মের

ফল-ভোক্তারূপে অবস্থান করিতেছে; তোমরা এই অচেতন পঞ্চ-মহাভূত এবং চেতন জীবাত্মাকে তোমাদের হৃদয়স্থিত আমার স্বরূপ মধ্যে প্রতিভাত ভাবে অবলোকন কর। যে পরা-ভক্তি হইতে এই স্বরূপ-দৃষ্টির সামর্থ্য জন্মে, ভগবানের ইচ্ছায় তোমাদের সেই অতুলনীয় পরা-ভক্তি লাভ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ থাকিলে তোমাদের হৃদয়-মন্দির হইতে আমার অন্তর্দ্ধান কখন সম্ভবপর হইতে পারে না।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই গুঢ়তম আধ্যাত্মিক বিদ্যা লাভ করিয়া—তত্ত্বজ্ঞানজাত এই স্বরূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুধ্যান দ্বারা লিঙ্গ-শরীর রূপ পঞ্চকোষ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীত অক্ষয় মূর্ত্তি তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রেম-ভক্তি-প্লাবিত অন্তরে, পুলক-পূর্ণিত দেহে, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! যোগীগণের সাধনের যাহা পরম উদ্দেশ্য, সংসারী জীবের সংসার-সাগর পার হইবার যাহা একমাত্র অবলম্বন সেই পদ্মনাভের পাদপদ্মদ্বয়, আমরা গৃহসেবিনী গৃহস্থ-রমণী হইলেও আমাদের মনে যেন সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে, ইহাই আমাদের আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

জ্ঞানময় শ্রীকৃষ্ণ ষটচক্রভেদ-রূপ অমূল্য শিক্ষার প্রেমময় পথ দেখাইয়া দিয়া ব্রজবিহারিণীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন,—তাঁহারাও প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়েশ্বরকে চিরসহচর স্বরূপে পাইয়া জগতে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

—:*:—

বসুদেব এই সূর্য্য-গ্রহণোপলক্ষে প্রভাসতীর্থে দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, অত্রি, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণের সমাগম দেখিয়া এই সময়ে দান-যজ্ঞ ক্রিয়া সাধনের অভিলাষ করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মাভিলাষ কোন্‌কালে অসম্পূর্ণ থাকে? শ্রীকৃষ্ণ পিতার যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যোগ-বিধান করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ ঋত্বিক-কার্য্যে বরিত হইলেন, দীক্ষা আরম্ভ হইল। যদুগণ ও রাজন্যবর্গ স্নান করিয়া মাল্য ধারণ ও পবিত্র-বাস পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে দীক্ষাশালায় উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ঋত্বিকেরা বসুদেবকে পত্নীগণসহ অঞ্জন ও অভ্যঞ্জন দ্বারা যথাবিধানে অভিষেক করিলেন। পীত কৌশেয় বাস-পরিধৃত অগ্নিহোতৃগণ কর্ত্তৃক বেদোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞ-ক্রিয়া আরব্ধ হইল। মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, দুন্দভি প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। সঙ্গীতাচার্য্যগণ কণ্ঠনাদের কৌশল দেখাইয়া সময়োচিত রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন। স্বস্তিবাচন, মন্ত্রোচ্চারণ বেদধ্বনি প্রভৃতিতে যজ্ঞ-স্থল নিনাদিত হইতে লাগিল, হোমাগ্নি ঘৃতচন্দনাদি উদরস্থাৎ করিয়া সুবাস বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। এইরূপ মহামহোৎসবে মহামতি বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান সমাহিত হইলে তিনি দান-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যথাযোগ্য দক্ষিণাসহ যথোচিত পূজোপহার প্রাপ্ত হইলেন। দীন-দুঃখী, অনাথ-আতুর, যাচক, উপযাচক

সকলেই আশাতীত অর্থ, বস্ত্র, ধনরত্নাদি লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

অবশেষে বসুদেবের দান-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে রাজন্যগণ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ বচনে আপ্যায়িত করিয়া আপন আপন অভিলষিত পথে প্রস্থান করিলেন। কেবল বৃন্দাবনবাসীগণ তখনও শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তাঁহারা আরও তিন মাস কাল প্রভাস-তীর্থে বাস করিলেন। পরিশেষে ঘোরতর বর্ষা সমাগত হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শোকোচ্ছাস-ময় বিদায়ব্যাপার শেষ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। যাদব-গণও কৃষ্ণ বলরামের সহিত দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।



আমাদের ধৰ্ম্ম।

—:*:—

এইবার আমরা দ্বারকা ছাড়িয়া মহাভারতের মহাক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ধর্ম্মপ্রাণ বাসুদেবের এই ভারতলীলাতেই সুমহান ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন ও নিগূঢ় ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রচার ক্রিয়া দেখিতে পাইব। যাঁহার সমুন্নত ধর্ম্ম প্রণালী সমস্ত জগতের উপযোগী ও সমুদায় জীবমণ্ডলীর হিতকর, তাঁহার সেই সুমহান ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে—বাঙ্গালী আমরা—আমাদের নিজের সমাজ-ধর্ম্ম একবার বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম বন্ধনই হিন্দুদিগের উত্থান-শক্তির মূলভিত্তি। আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, পরিধানে উপবেশনে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়তর শাসন এবং সেই শাসনের উপরই হিন্দুসমাজের স্থায়ীভিত্তি অবস্থান করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিক সুশৃঙ্খলায় সংস্থাপিত আলবালে পরিবেষ্টিত। তথায় স্বেচ্ছাচারের প্রবেশাধিকার নাই, গুরু শিষ্য সংঘর্ষণ নাই, অহং-জ্ঞানের মোহাবেশ নাই, অনধিকার চর্চ্চার উৎপাত নাই; কেবল সরলতাময় বাধ্যবাধকতার প্রেমময় দৃষ্টি, পুরুষানুক্রমিক ক্রম-বিকাশের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হায়! আমরা এখন আপনাদিগকে সেই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ স্তবকসজ্জিত, সীমা সংবেষ্টিত ক্রমোত্থিত সোপা-

নোপরি পবিত্র ক্ষেত্রে সংরক্ষিত সুপবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের পতাকাধারী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি; সেই হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্র স্বরূপে ঘোষণা করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি স্বেচ্ছাচার যাহাদের মূলমন্ত্র, স্বেচ্ছানুসরণ যাহাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম কথা যাহাদের তর্ক মাত্রে পর্য্যবসিত, আরাধনা যাহাদের অক্ষর সমষ্টি, অনধিকার চর্চ্চাই যাহাদের বিদ্যাবত্তার লক্ষণ, পূজা পরিবর্জ্জনই যাহাদের সভ্যতার পরিচয় তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে কত দূর অধিকারী? গৃহে বর্ণজ্ঞান-বিহীনা বিধবা জননী অনন্ত ব্রতের উদ্‌যাপন জন্য উপযুক্ত পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের অবসর বুঝিয়া ভয়ভীতস্বরে ধীরে ধীরে অর্থ প্রার্থনা করিলেন। মহাজ্ঞানী ধীরেন্দ্রনাথ, হার্ব্বাট স্পেন্সার, মিল, ডারউইনের কোটেসন তুলিয়া "মাকে" জলবৎ তরলং বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রত অনশন সমস্তই লোভী ব্রাহ্মণগণের মস্তিষ্কপ্রসূত জুয়াচুরি ফন্দি ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং ইহার জন্য বৃথা শরীর নষ্ট বা অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে! মাতা অতশত উৎকট বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, উপযুক্ত পুত্র ক্ষমতাসত্বেও দিলেন না ভাবিয়া, ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু নিজের মনোবেগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না;—চক্ষুপার্শ্বে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বাহিরে উপার্জ্জনশীল পুত্রপ্রবর ধীরেন্দ্রনাথ মহাসমারোহে বাগান-ভোজে কুক্কুটপিষ্টকের আয়োজন হেতু পাঁচশত টাকার পঞ্চখানি কেতা দুরস্ত নোট আলম্বিতবেণী চটুলনয়নী বারবিলাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাঠক! একি ধীরেন্দ্র নাথের দোষ? তাই বা, কেমন করিয়া বলিব! সমাজ

এ কথাত বিশেষরূপ জানেন, ধর্ম্মধ্বজীগণ ব্যবস্থার এমন দৃষ্টান্ত ত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তথাপিও ত বাঙ্গালীর হিন্দুসমাজে ধীরেন্দ্র নাথের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ! তিনি মানী, জ্ঞানী, সদ্‌বিবেচক ও সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্বপ্রধান পরামর্শদাতা; আবার শুধুই কি তাই! ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন জন্য ভাণ্ডার সংস্থাপনের সময় যশঃ-প্রার্থী ধীরেন্দ্রনাথ তিন শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন, সুতরাং ধর্ম্ম-যাচক মহাপ্রভুদিগের আটচালায় ধীরেন্দ্র বাবু ধর্ম্ম-কর্ম্মে ধার্ম্মিক চূড়ামণি! চরিত্র বিষয়ে আদর্শ শিরোমণি। আবার চতুষ্পাঠীর তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ও উকীল-শ্রেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথের অট্টালিকায় ভোজ বিদায়ের সুযোগ পাইলে বিধবা অন্নকালীর কুটীরে পদার্পণ করিতে বড় একটা রাজী নহেন। মজলিসেও ধীরেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি ধরে না, পথ ঘাটে সম্মুখে পাইলে ধীরেন্দ্রনাথ-শিরে আশীর্ব্বাদ-বৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে, তাহার গুণকীর্ত্তন সর্ব্ব প্রথমে। তবে ভাই ধীরেন্দ্র নাথের দোষ কি? সমাজ তাহাকে শিরে ধরিয়া রাখিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাকে মাথায় তুলিয়াছে, ধর্ম্মসভা তাহাকে কোলে লইয়াছে; শাসন শৈথিল্যের উপর এমন আদর অভ্যর্থনায় ধীরেন্দ্রনাথ মজা লুটিতে ছাড়িবে কেন? শিক্ষাদীক্ষায় বিকৃত করাইয়া জীবনব্যাপী আমোদের পথ দেখাইয়া এখন বাজে বক্তৃতার বিলাতী তুফানে সমাজকে সংযমের পথে ফিরাইতে চাহি, এওত বড় কম রহস্য নহে।

পাঠক! আবার এক দৃশ্য দেখুন,—বিক্রমপুরের গোবর্দ্ধন গোয়ালা বাবা তারকনাথের শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনে জীবন চরিতার্থ করিবার মানসে তারকেশ্বরে আগমন করিয়াছে। সেই সঙ্গে অমনি একবার গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া যাইবে, এ আশাও হৃদয়ে

বাঁধিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। গোবর্দ্ধনের গুরুদেব কলিকাতা সহরে গোস্বামী পাড়ায় বাস করেন। গোয়ালা গোবর্দ্ধন দীক্ষা গুরুর পাদপদ্মে সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা রাখিয়া চরণামৃত পান করিবে, এই আশায় কলিকাতায় গুরুদেবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে গুরুদেব তখন উপস্থিত নাই, বাড়ীতে শিষ্যসমাগমে লাভের আশা বুকে বাঁধিয়া এবং গোবর্দ্ধনের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মহাপ্রভু ধবলচাঁদ গোস্বামীকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল। প্রায় এক ঘণ্টা হইল তথাপি কাহারও উদ্দেশ নাই, গোবর্দ্ধন বড়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রভু কোথায় গিয়াছেন বলিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথাও প্রকৃত উত্তর পাইল না।

যাহা হউক অবশেষে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দেখা দিল। উভয়ের স্কন্ধে ভর রাখিয়া গোস্বামীদেব বৈঠকখানায় সমানীত হইলেন। গোবর্দ্ধনের ধূলিপায়ে গুরুপদ দর্শন বাসনা পূর্ণ হইল। কিন্তু গুরুদেব শিষ্যসহ বড় বেশী কথাবার্ত্তা কহিলেন না। কথা না কহুন, গোয়ালা এত পুণ্য করে নাই যে, গুরুদেবের বচনামৃত পানে জন্ম সার্থক করিবে! তবে কি না বিলাতী-বুদ্ধিবিহীন গোয়ালা মন মধ্যে কুভাবের কোন স্থান না রাখিয়া নিজে গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক শুদ্ধবাসে গুরুদেবের জন্য মিষ্টান্ন ভোগ লইয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেব সমীপে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পদরজ গ্রহণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ নিজের সাধ্যমত দশটী টাকা এবং এক কুম্ভ সদ্যজাত ঘৃত—মর্ত্ত্যের অমৃত হৈয়ঙ্গবীন প্রদান করিল।

অনন্তর গুরুদেবের সেবা হইলে প্রসাদ লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এই বাসনায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়!

সেবক সম্মুখে গুরুদেবের সেবা হইল না। শিষ্যের জন্য স্বতন্ত্র আহারের বন্দোবস্ত হইল এবং শিষ্য অপরিমিত আহার সামগ্রী পাইল বটে, কিন্তু শিষ্য-সংগৃহীত মিষ্টান্ন ভোগ গুরুদেব তখন মুখে দিলেন না! গোঁসাইজী রঙের মুখে তরবেতর দেখিতেছেন, তিনি মদের নেশায় মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া সাধের আশায় জলাঞ্জলি দিতে চাহেন না; তাই শিষ্য আনীত সন্দেশ ভোগ তাঁহার মুখে উঠিল না। কিন্তু অসভ্য গোয়ালা এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিল না, তাহার গুরুদেব যে নেশায় ঢুলু ঢুলু তাহা তাহার মনোমধ্যেই উদিত হইতে পারিল না। হইবেই বা কেমনে? যিনি গুরুমন্ত্র কর্ণে দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন, যিনি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ বিধানে দীক্ষামন্ত্র দান করিবেন, পবিত্রতার শুদ্ধাবাসে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তিনি কিনা আজ বারুণীসহ বারাঙ্গনার সম্মিলিত স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছেন, কুপ্রবৃত্তির দাসানুদাস স্বরূপে অপবিত্রতার নরক-ভূমে কীটক্রীড়ায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন! গুরুভক্ত পাঠক! এ কথা কি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়, এ ভাব কি মনে আনিতে সাহস জন্মে! তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? কি করিব, ইহা যে জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য! আজ কাল তাহাও আবার বড় বিরল নহে। তবে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? যাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান পাণ্ডা, মুক্তি পথের প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং অজ্ঞানান্ধকারের সমুজ্জ্বল আলোক-রেখা-স্বরূপ, তাঁহারাই যদি আজ আপনাকে আপনি হারাইলেন তবে বাঙ্গালীর ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায় কি বুঝিব?

পাঠক! আসুন, এখন একবার মহামায়া দশভুজার প্রতিমা পূজার আয়োজন-মণ্ডপে আসিয়া দেখুন—হয়তঃ ষোড়শোপচারের

বিশাল আয়োজনে পূজার দালান পরিপূর্ণ, ধূপ ধুনার ধূমহিল্লোলে চতুর্দ্দিক আমোদিত, পূজাপদ্ধতির উদ্যোগ প্রকরণে নানাজনে নিয়োজিত। কিন্তু এদিকে পুরোহিত ঠাকুর আচমনের প্রকৃত ফল ছাড়িয়া দর্শকদিগকে হস্তচালনার নৈপুণ্য দেখাইতেছেন, বাজীকরের বাজী খেলাইতেছেন। হায়! যিনি আজ ত্রিগুণময় ওঁঙ্কার-সমাযুক্ত ত্রিদণ্ডীধারণ মহিমায় স্বীয় ধ্যানযোগ প্রভাবে আবাহন-উদ্বোধন-মন্ত্রে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির সঙ্কর্ষণ প্রভায় প্রতিমায় প্রাণাবির্ভাব দেখিবেন, দর্শক-বৃন্দও রোমাঞ্চ শরীরে আপনাপুনি প্রণত হইয়া হৃদয়ে মহামায়ার জ্বলন্ত মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে থাকিবে, তিনি কিনা অনুস্বার-বিসর্গের সুর ভাঁজিয়া আবাহনে বিসর্জ্জন গাহিয়া লাভালাভের ওজন বুঝিতেছেন, দানদক্ষিণার হিসাব খতাইতেছেন, ধ্যানে বসিয়া চোক্ বুজাইয়া লাভের টাকায় ব্রাহ্মণীর নথের বাহার কল্পনা করিতেছেন, অহিফেনের ঝোঁকে নিস্তব্ধতার আশ্রয় লইয়া দর্শক সমীপে দৃঢ়তর মনসংযোগের পরিচয় দিতেছেন!!! হায়! যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী ত্রিশক্তিসম্পন্ন ত্রিদণ্ডী-ধারক, মূর্ত্তিমান মন্ত্রাধিষ্ঠানকারী দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণ পূজক, তিনি কিনা আজ ধোপদোরস্ত সূত্র-গুচ্ছধারী সন্ধ্যাহ্নিকবিবর্জ্জিত মন্ত্রজ্ঞানশূন্য পড়ন্তপাখী পুরোহিত ঠাকুর!!! আবার তিনিই কিনা মহাশক্তির মহাপূজার আরাধনা-গুণে শক্তি-সামঞ্জস্য বিধানে যজমানের হিতসাধন কল্পে নিয়োজিত। হায়! ইহা অপেক্ষা বিষম বিড়ম্বনা আর কি আছে?

পাঠক! আরও দেখুন, এ দিকে কর্ত্তা বাবুও এ বিষয়ে বড় কসুর নাই। তিনিও নিজের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে প্রতিমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া নৃত্যগীতপারদর্শিনী বারাঙ্গনার কুটিল কটাক্ষময়

হাবভাবে মাতিয়া নেশার ঝোঁকে বেল্লিকবাজারের বেলেল্লাগিরিতে মত্ত হইয়াছেন, মাঝে মাঝে হুঙ্কার-লীলার বীভৎস-কাণ্ডে হাবু-ডুবু খাইতেছেন !!! হায় ! ইহা অপেক্ষা পূজার বাহাদুরী আর কি আছে ? এখন মহাশক্তি দশভূজার আরাধনায় শক্তিসাধনা স্থলে নেশার চতুরঙ্গে আবকারী-বিদ্যার পারদর্শিতা-পরীক্ষা চলিয়াছে, জগন্মাতা মহামায়ার উপাসনা গৃহে-বারাঙ্গনা-লীলা-সন্দর্শনের সুযোগ স্বরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সমাজও অক্ষুব্ধ-চিত্তে এ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেছে।

পাঠক ! শুদ্ধ এই দুই চারিটী নহে, শত সহস্র পথে এইরূপ কেলেঙ্কারী চলিয়াছে, তাহাতে কাহারও বাধা বিড়ম্বনা নাই, আপত্তি উত্থাপন নাই, শাসন সমাবেশের চিহ্নমাত্রও নাই। তাই জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মধ্বজী বাঙ্গালী ! তোমাদের ধর্ম্মাচরণ কোথায় ? তোমাদের নিজের ধর্ম্ম কি আছে ? কোন্ পথেই বা তাহার সেবা করিতেছ ? এই ত সকলেই আপন আপন ধর্ম্মরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে, আপনার জিনিষ বলিয়া যত্ন করে। এইত খ্রীষ্টান মিশনারি আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তৃতির জন্য অর্থ ব্যয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না, মানাপমানে দৃষ্টি রাখে না, পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হয় না, অধ্যবসায় পরিত্যাগ করে না ; আবার এই ত ম্লেচ্ছ-যবন, মুসলমান স্বীয় ধর্ম্মের নামে মুহূর্ত্ত মধ্যে দলে দলে সমাযুক্ত হইয়া ধর্ম্মপতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান থাকিয়া অকাতরে শত শত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সমুদ্যত রহিয়াছে ; কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী বাঙ্গালী আমরা ! ধর্ম্মের জন্য কি করিতে পারি ? নিজের ধর্ম্ম বলিয়া কি কোন স্বতন্ত্র জিনিসের সত্তা রাখিয়াছি, না, মহা হুজুগের বিপুল তরঙ্গে মাতিয়া হুজুগপ্রিয়তা গুণে ধর্ম্মের নামে মনোমত বাগান

বানাইয়াছি, আর সুপবিত্র হিন্দুধর্ম্মের সুমহান নামে ভোজবাজীর গুপ্ত খেলা খেলিতে প্রয়াস পাইতেছি, রসের লীলা খেলায় মাতিয়া উঠিতেছি!

তাই বলি, যাহারা শিক্ষাদীক্ষায় খ্রীষ্টীয়ান, আহার-বিহার আচার বিচারের স্বেচ্ছাচারিতায় মুসলমান, পরিচয়ে হিন্দুসন্তান, কাজ কর্ম্মে নাস্তিক-প্রধান, তাহ'দের বহুরূপী ধর্ম্মাচ্ছাদনের অভ্যন্তর ভাগে কি আছে কেমনে বুঝিব? তাহাদের ধর্ম্মান্দোলনে ধর্ম্মতত্ত্বই বা কেমনে জানিব। "বাঙ্গালীর হিন্দুধর্ম্মের" প্রকৃত অর্থ কেমনেই বা হৃদয়ঙ্গম করিব। হায়! এহেন বাঙ্গালী আমরা —আমাদের নিকট পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ-ধর্ম্মের আদর্শ-উপদেশ কত দূর কার্য্যকরী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া স্থির করিব।



পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের ভারত-লীলা।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পাঞ্চাল নগরের প্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতলক্ষেত্রে স্বয়ম্বর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভাস্থল প্রাকার-পরিখাদি পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী শোভা পাইতেছে, তাহাদের কুট্টিমভূমি রমণীয় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্র-পাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গসমূহ যথাবিধানে সংস্থাপিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম সভাগৃহের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। স্থানে স্থানে মনোহর আসন ও দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা অপরবিধ উৎসবক্রিয়া মহাড়ম্বরে সম্পাদিত হইতেছে। ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইয়াছেন, পৌরবৃন্দ ও জানপদবর্গ বিবাহ ব্যাপার দর্শনার্থ মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়াছেন, ছদ্মবেশধারী পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ

সমভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতেছেন।

এমন সময় দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীসহ সভামধ্যে সমাগত হইয়া স্বয়ম্বর জন্য বিরচিত সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন ও কৃত্রিম আকাশ-যন্ত্রস্থিত লক্ষ্যের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে, যিনি এই শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক পঞ্চশর নিক্ষেপ দ্বারা যন্ত্রের ছিদ্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবেন, পাঞ্চালী তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিবেক।

অনন্তর বীরপ্রধান রাজন্যবর্গ একে একে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐই লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে অসমর্থতা দেখাইয়া লজ্জাবনত মুখে পুনরায় উপবেশন করিলেন। এই সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদুবংশীয় বীরগণসহ এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাক্ষেত্রে স্থানগ্রহণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত ব্যক্তি-বৃন্দকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পরে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশধারী পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুপদকন্যাপেক্ষা তাহাদিগেরই বিষয় নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে যখন যদুবীরগণ লক্ষ্য-বিদ্ধ প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন অনন্ত বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পিতৃস্বসাতনয় পাণ্ডবকুলের স্বয়ম্বরক্ষেত্রে উপস্থিতি বিবরণ বলরামকে জ্ঞাত করাইলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও তাঁহাদের জননী কুন্তীদেবী জতুগৃহদাহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া বলদেব পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

এদিকে সভাস্থিত নৃপতিবর্গ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যভেদে অসমর্থ ও পরাঙ্মুখ হইলে, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিপ্রমণ্ডলী-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লক্ষ্যস্থলে শরাসনসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে লক্ষ্যভেদ করিলেন। তখন ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণা তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্না দেববাঞ্ছিত কন্যারত্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপভোগিনী হইবে দেখিয়া ক্রোধান্ধ রাজশার্দ্দূলগণ দ্রুপদ-রাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমার্জ্জুন দ্রুপদ-রাজের রক্ষার্থ নৃপতিগণের সম্মুখীন হইয়া রণসাজে দণ্ডায়মান রহিলেন। কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের এবং শল্যের সহিত ভীমের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমরসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া মতিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধোন্মত্ত রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়-বচনে কহিলেন, হে ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। সকলে দেখিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম বীরকুলের অগ্রগণ্য, বিশেষতঃ যদুবংশীয় যোদ্ধাগণ সকলেই এ ক্ষেত্রে উপস্থিত রহিয়াছেন। অধিকন্তু ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদ্বয় যেরূপ রণকৌশল ও অমিতপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যাদবকুল ও সসৈন্য দ্রুপদবংশ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলে সহজে জয়-লাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া ও অধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইলে, অধর্ম্মাচারীগণেরই চিরকাল পতন ঘটিয়া থাকে চিন্তা করিয়া রাজন্যবর্গ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইলেন।

অনন্তর বাসুদেব পরমধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পাণ্ডবেরা এহেন হিতার্থী আত্মীয়লাভ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে কৃষ্ণ ও বলরাম পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অজ্ঞাতশত্রু যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সাদর-সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা-গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছি, আপনি কিরূপে আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন? কৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়, পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ ভাগ্যবলে আপনারা ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, আপনারা ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন।

পরে বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্বীয় স্কন্ধাবারে প্রত্যাগত হইয়া কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ নানাবিধ বসনভূষণ, মণিরত্ন, বিবিধ গৃহসামগ্রী, রজতকাঞ্চনাদি প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রীসমূহ আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদরাজ্য হইতে স্বীয়রাজ্য দ্বারকাভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সুভদ্রাহরণ।

অমিতবিক্রম অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরব্যাপী তীর্থভ্রমণকালে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ প্রিয়সখার আগমন সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎকার লাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সেইস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান পূর্ব্বক রৈবতক পর্ব্বতে কৃষ্ণ-পুরীতে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারকানগরে বাসকালীন অর্জ্জুন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বাসুদেব-দুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষ শ্রীকৃষ্ণসমীপে পরিব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় ভগিনীর এতদপেক্ষা যোগ্যপাত্র প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে ভাবিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! স্বয়ম্বর-স্থলই ক্ষত্রিয়দিগের প্রকৃত বিবাহ স্থান; কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়কুলের প্রশংসনীয়। অতএব যদি তোমার মন সুভদ্রার প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহের উপযুক্তকালে তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ, স্বয়ম্বরে সে কাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিবে কে বলিতে পার?

অর্জ্জুন বাসুদেব মুখে ইতিকর্ত্তব্যতা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির সমীপে সংবাদ পাঠাইবার জন্য দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ইহাতে কৃষ্ণের

অভিমত আছে জানিয়া অর্জ্জুনের অভিলাষে অনুমোদন করিলেন।

যথাসময়ে অর্জ্জুন সুযোগ বুঝিয়া রৈবতক পর্ব্বত হইতে দ্বারকাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত সুভদ্রাকে হরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত রথে আরোহণ করাইয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাবীর যাদবগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং রণসাজে সজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনকে যথোচিত শাস্তিপ্রদান জন্য কৃষ্ণের নিকট তাঁহার দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কুলপাংশুল অর্জ্জুন, আমাদিগের বংশের অবমাননা করিয়া আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, আপনাব অভিপ্রায় অবগত হইলেই তাহার মৃত্যুবাণ পরি নিক্ষিপ্ত হইবে।

বাসুদেব যুক্তিযুক্ত প্রবোধবাক্যে কহিলেন, যদুবীরগণ। অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ কবিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করাও অতীব দুরূহ ব্যাপার, এইজন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। আমার অনুমান হইতেছে, এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়াই ধনঞ্জয় বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের

কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুল-শীল-বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন। বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না, তিনি সর্ব্ব-বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে ধনঞ্জয় সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা সকলের কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এইরূপ উপদেশমূলক প্রত্যুত্তর পাইয়া যাদবগণ অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর যথাবিধানে সুভদ্রার পাণিপীড়ন ক্রিয়া সমাধা হইল।

খাণ্ডবদাহ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসখা অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থান-কালীন নগরের সন্নিহিত প্রকাণ্ড খাণ্ডববন অগ্নিদেবের উদরস্থাৎ করাইয়া তাহা মানবগণের ব্যবহারোপযোগী কার্য্য-ক্ষেত্ররূপে পরিণত করেন। পূর্ব্বে এই নিবিড় জঙ্গলভূমি হিংস্র শ্বাপদ ও বিষধর সর্পাদির আবাসভূমি হইয়াছিল। এক্ষণে অগ্নিসংযোগে বন দগ্ধ করিবার সময় হিংস্রজন্তু ও ক্রূর-প্রকৃতি সর্পগণ ভীষণবেগে প্রধাবিত হইতেছে দেখিয়া ও তাহাদের দ্বারা খাণ্ডবপ্রস্থবাসী জনসাধারণের সবিশেষ অমঙ্গল আশঙ্কায় কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন।

প্রজ্জলিত হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় দীপ্তজিহ্ব প্রচণ্ড অনলশিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া খাণ্ডববন-নিবাসী ময়দানব 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে আর্ত্তনাদ

করিতে লাগিল। দয়াপরবশ অর্জ্জুন তাহাকে অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। ময়দানব অর্জ্জুনের দ্বারা দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিবার বাসনা জানাইলে অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমা দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। তখন ময় অর্জ্জুনের আদেশমত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলে তিনি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনোদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের জন্য অননুকরণীয় অনুপম রাজসভা নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। অনন্তর বাসুদেব খাণ্ডবদাহাবসানে কিয়দ্দিন পাণ্ডবরাজ্যে বাস করিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

জরাসন্ধ বধ।

যথাসময়ে ময়দানব কর্ত্তৃক অলোকসামান্য মণিময় সভাগৃহ বিনির্ম্মিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করণাভিলাষে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানময় শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকাভবন হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইলেন।

যথাবিহিত আদর অভ্যর্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলি-

লেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয়যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার অন্যান্য সুহৃদগণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনার পরামর্শ ব্যতিরেকে এহেন গুরুতর কর্ম্মানুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি না। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন; কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! পৃথিবীতে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। আপনি উক্ত দোষসমূহ বিবর্জ্জিত, অতএব আপনি আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত রাজন্যবর্গকে স্বদলে আনিয়া সম্রাট্ পদে বরিত না হইলে, রাজসূয়ানুষ্ঠানে অধিকারী হয় না। মগধাধিপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে ভূপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ ও ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞের মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের অত্যাচার নিবারণ করিতে যত্নবান্ হউন, নচেৎ কোনক্রমেই রাজসূয়যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ঐ নির্ম্মমহৃদয় দুরাত্মা যে ষড়শীতি জন ভূপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আর চতুর্দ্দশ জন আনীত হইয়া, তাহাদের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইলেই ঐ নৃপাধম উঁহাদের সকলকে এক-

কালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূরকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উঁহাকে শাসন করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যলাভ করিবেন। এইরূপে সাম্রাজ্যলাভ করিলে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে সফল-প্রযত্ন হইতে পারিবেন।

অনন্তর বহু পরামর্শের পর জরাসন্ধ বিজয় সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইলে ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর জরাসন্ধের সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিয়া বৃথা লোকনাশ অপেক্ষা দ্বন্দ্বযুদ্ধই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং মগধরাজ্যে গমন করিলেন।

তথায় বীরবর জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইলে সে ভীমকেই আপনার সমকক্ষ ভাবিয়া তাঁহারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দশ দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর জরাসন্ধ নিহত হইলে, কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারারুদ্ধ মহীপালদিগকে বিমুক্ত করিলেন। তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া নিজেদের পুনর্জন্ম বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

অর্ঘাভিহরণ।

ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে পুরবর্ত্তী করিয়া, জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের অঙ্গস্বরূপ রাজসূয় যজ্ঞ সমারব্ধ হইল। এই বিরাট যজ্ঞ ব্যাপারের এক একটি কার্য্যভার উপযুক্ত বুঝিয়া এক এক জনের প্রতি সমর্পিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। নানা দিগ্‌দেশাগত রাজগণ, ঋষিকুল ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর সভাস্থলে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সময়ে অর্ঘ প্রদান কাল উপস্থিত হইলে, সমস্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কে, তাহার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

আজকালও কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রকচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে প্রচলিত কথায় "মালাচন্দন" বলে। তবে এখনকার ন্যায় তখন কেবলমাত্র বংশমর্য্যাদা দেখিয়া অর্ঘ প্রদান করা হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যাহা হউক, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন, নিখিল বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ও বলবিক্রমে অগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণই অর্ঘ প্রাপ্ত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। বিজ্ঞপ্রবর ভীষ্ম ও অধিকাংশ নৃপতিবৃন্দের অনুমোদন ক্রমে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাকেই অর্ঘ প্রদত্ত হইল। কৃষ্ণও শাস্ত্রসম্মত বিধি পূর্ব্বক সেই অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিলেন।

শিশুপাল বধ।

চেদিরাজ মহাবল শিশুপালের এই কৃষ্ণার্চ্চনা সহ্য হইল না। তিনি ভীষ্ম ও পাণ্ডবদিগকে এই কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন সুযোগ বুঝিয়া সুনীথাদি কৃষ্ণদ্বেষী নৃপতিবর্গ শিশুপালের সহিত যোগদান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদনে সচেষ্টিত হইলেন। মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া পড়িলেন। কুরু পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন যে, যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুকুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই মরণ কণ্ডুয়নগ্রস্ত রাজমণ্ডল চীৎকার করিতেছে, বিশেষতঃ শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই ইহার তেজ হরণ করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মের বাক্যে অধিকতর কুপিত হইয়া তাঁহাকে এবং বাসুদেবকে নানা কটুকাটবা বলিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম বৃথা কটুকথা প্রয়োগে মীমাংসিত হইবার নহে জানিয়া শেষ মীমাংসাস্বরূপ বলিলেন, আমরা গোবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াই তাঁহার পূজা করিয়াছি। যদি তোমাদের তাহা অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, যদি তোমাদের নিতান্তই মরণ-কণ্ডুতি ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, একবার যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখ।

বিক্রমশালী, গর্ব্বিত চেদিরাজ কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুরোধে এবং যজ্ঞ রক্ষার

নিমিত্ত সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রভূত প্রতাপশালী শিশুপাল ক্ষণকালমধ্যে পরাভূত হইলে যজ্ঞনাশপ্রয়াসী ক্ষত্রিয়-গণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল, এবং করূষরাজ প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় দেখিয়া শিশুপালকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞ সমাহিত হইলে পর, বাসুদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।



ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক তত্ত্ব।

পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট পরাজিত হইয়া পণের নিয়মানুসারে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত-বাসে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিরাট রাজগৃহে একবৎসর অজ্ঞাত বাসের পর বিরাট নৃপতি পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দসহকারে স্বীয় কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু হস্তে সম্প্রদান করিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে অভিমন্যুর মাতুল শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদরাজ ও অন্যান্য কুটুম্ববর্গও আগমন করিলেন।

বিবাহের পর পাণ্ডবহিতাকাঙ্ক্ষী সমবেত রাজন্যবর্গ সমীপে পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবকুলের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি

গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিসংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভাত্র-নাশ বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু যদি দুর্ম্মতিবশতঃ দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া সন্ধি না করেন, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। এইরূপ পরামর্শদানের পর শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সন্ধিসংস্থাপন চেষ্টায় কুরুসভায় পাঞ্চালপুরোহিতকে দূতস্বরূপে পাঠাইয়াও কোন ফল হইল না দেখিয়া উভয়পক্ষ হইতে সমরোদ্যোগ চলিতে লাগিল।

*ধনঞ্জয় স্বয়ং দ্বারাবতী নগরে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করি-*লেন। অপরদিকে দুর্য্যোধনও শ্রীকৃষ্ণকে স্বদলে আনিবার জন্য দ্বারকানগরে যাত্রা করিলেন। এইরূপে উভয় বীরই একদিবসে আনর্ত্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক-সমীপ-ন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। কুন্তীকুমার পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতল সমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকার পূর্ব্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্তবদনে কহিলেন, হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্যদান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রচলিত আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে অর্জ্জুনের বরণ করাই উচিত।

এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করিবে, আর অন্যপক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করিব; ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয়, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ বিবেচনা করতঃ পরম প্রীত হইলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন প্রস্থান করিলে পর বাসুদেব অর্জ্জুনকে

কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরে পরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবান্! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ এবং আপনার কীর্ত্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত, আপনি নিরস্ত্র থাকিয়াও আমাকে পরিচালন করিলে আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশলাভ করিতে পারিব; এই বাসনায় আপনাকে সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আপনি আমার রথে অধিরূঢ় থাকিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার অভিলাষ।

বাসুদেব যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অর্জ্জুনের তেজগর্ভবাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া বলিলেন, অর্জ্জুন! তোমার রথে থাকিয়া পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে হইলে সারথ্য-কার্য্যই এক্ষেত্রে প্রকৃত উপযোগী। অতএব যুদ্ধে আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিব।

সঞ্জয়যান।

পাণ্ডবদিগের দূত প্রেরিত হইলে পর কুরুকুল সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাসুদেবও সেই সময় পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের উপর নানারূপ দোষারোপ করিলে পর বাসুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত আকাঙ্ক্ষা করি, এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি-সংস্থাপন হয়, ইহাই আমার অভিপ্রেত; আমি উহাদিগকে

ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি-সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদের সন্ধি-সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই; ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজনপরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?

হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথ চালনে সুনিপুণ, এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া রাজ্যলাভের অন্য কোনরূপ উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। নতুবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্মসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। রাজা দুর্য্যোধন নিরন্তর রাজধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য কৌরবগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে পরস্ব অপহরণ করে উভয়ই নিন্দনীয়; সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও এক প্রকার তস্কর কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে; তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অন্যায্য;

পাণ্ডবগণের ন্যস্ত সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি কি নিমিত্ত অন্যে গ্রহণ করিবে? এই নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।

হে সঞ্জয়! এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থ হানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য আমি হস্তিনানগরে গমন করিব। যদি তাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

অনন্তর সঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদিগের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যবিধি।

যদুবংশাবতংস বাসুদেব রেবতীনক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্ত্তে কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন, এবং বৃষলাঙ্গুল স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক সাত্যকিকে বলিলেন, ভদ্র! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য আয়ুধ সকল স্থাপন কর। দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি নিতান্ত দুষ্টাত্মা; বলবান ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর যদুকুলপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিসহ রথে আরোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে ভগবান মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। সারথি দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বদিগকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাত্মা হৃষীকেশ সন্ধ্যা সমাপনান্তে সমভিব্যাহারী জনগণকে সেইস্থানে রজনী অতিবাহিত করণের অভিপ্রায় জানাইলে, তাহারা ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যকুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা জনার্দ্দনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চন পূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার স্বীয় পটমণ্ডপে প্রত্যাগত হইলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরমসুখে যামিনী যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে দেবকীনন্দন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্নিক কার্য্য সকল সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বৃকস্থলনিবাসী ব্যক্তিগণ সেই মহাবাহুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল।

এদিকে কৌরবগণ কৃষ্ণাগমনবার্ত্তা পাইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সকল তাঁহার প্রত্যুদ্গমন নিমিত্ত গমন করিলেন। পুরবাসীগণ কৃষ্ণদর্শন মানসে কেহ কেহ নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া কেহ কেহ বা পদব্রজে আসিতে লাগিল।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণে পরিবৃত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও ভীষ্মকে বিনীত-বাক্যে পূজা পুরঃসর বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। পুণ্যাত্মা বিদুর অতিথি সৎকারোপযোগী দ্রব্যজাত দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া পাণ্ডব-দিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই বিষয়ে উভয়ের পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

হৃষীকেশ বিদুরকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্নে পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য সমাপন করিয়া বাষ্পগদ্গদবচনে ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত, যাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য কদাপি বিনষ্ট হয় না; তাহারা শত্রুদিগের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জন অরণ্যে গমন পূর্ব্বক কিরূপে অবস্থান করিত?

পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ পুত্রশোকে পরিক্লিষ্ট পিতৃস্বসাকে আশ্বাস-বচনে প্রবোধ দানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পিতৃস্বসা! আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না; আবশ্যক হইলে আপনার সদৃশ মহিলাদিগকে সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে

হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর, রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান। আপনি চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।

মহাত্মা গোবিন্দ এইরূপে স্বীয় পিতৃস্বসাকে প্রবোধ দিয়া দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। মহাযশা ধৃতরাষ্ট্রতনয় গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে তাঁহাকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ কবিলে তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, হে দুর্য্যোধন! দুতগণ কার্য্য সমাধানান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব। দুর্য্যোধন আপনার অতুলসম্পত্তি দেখাইবার জন্য কৃষ্ণকে পূজা গ্রহণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। তখন বাসুদেব ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, হে কৌরব! লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্নভোজন করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই,

আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই; তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথা হইতে বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর পরম যত্ন-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যথায়োজন ভোজন করাইয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

বিদুরের সহিত রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, তাঁহার কৌরবরাজ্যে আগমন করা অনুচিত হইয়াছে, দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; আপনার সহিত কৃতবৈর কালগ্রাসে পতনোন্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডব-গণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করি-য়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধিসংস্থাপনের কথা উত্থাপন করা আমার অভিপ্রেত নহে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বিদুর! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি, যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। মনুষ্য যথাসাধ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে সচেষ্ট হইয়া যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে, তথাপি তাহার সেই কার্য্য সাধনানুরূপ ফল প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তৎসম্পাদনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব। যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত

করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন। দুর্য্যোধন যদি আমার হিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে মিত্রকে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে। হে বিদুর! আমি কুরুপাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্ম্মিক মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে পারিবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধবিমূঢ় কুরুপাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিল না। আমি উভয়পক্ষের অর্থসাধন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিব। যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাব প্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আর আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থের অবিঘাতে কৌরবগণের সহিত তাঁহাদের সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্যলাভ ও কুরুপাণ্ডবদিগের মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

বিদুরের সহিত এইরূপ নানা কথোপকথনের পর যদুকুল-প্রদীপ বাসুদেব সুখস্পর্শ শয্যাতলে শয়ন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কুরুসভায় বাক্যানুবাদ।

বিভাবরী অতিবাহিত হইলে পর স্বয়ং দুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুর ভবন হইতে কৌরব সভায় লইয়া যাইলেন। তথায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং সংসারের হিতাকাঙ্ক্ষী মুনিঋষিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। পরস্পর আদর অভ্যর্থনাদির পর শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়, বীরপুরুষগণ বিনষ্ট না হয়, ইহাই আমার মানস, ইহাই আমার প্রার্থনা। রাজন্! আপনাদিগের বংশ, অন্যান্য সমুদায় নৃপতিকুলের শ্রেষ্ঠ; দয়া, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপ বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে বিশেষতঃ আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি হইতে অনুচিত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতুস্বরূপ। ভাবিয়া দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থনাশ করিবেন না।

অনন্তর ঋষিগণও নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ সহকারে ধৃতরাষ্ট্রকে বাসুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র নিজপুত্র গর্ব্বিত দুর্য্যোধনকে সমস্ত

বুঝাইয়া বলিলেন; ভীষ্ম, দ্রোণও দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তেজগর্ভ বাক্যে কেশবকে বলিলেন, কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তজ্জন্য পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়াছিল। এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার দুশ্চরিত্র ও পাপীচেষ্টা সকল উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অভিমানী দুর্য্যোধন কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া মহাক্রোধে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! কুরুবৃন্দ সকল ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধনকে শাসন করিতে না পারিলে আর কৌরবকুলের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। একের জন্য সমস্ত বিনষ্ট হইতে দেওয়াও আমার মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। একজন দুষ্টমতিকে পরিত্যাগ করিলে যদি কুলরক্ষা হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অতএব হে রাজন্! একের দোষে সমুদায় ক্ষত্রিয়ের বিনাশ সাধন অপেক্ষা আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করুন। নতুবা আর গত্যন্তর নাই।

বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে আবার দুর্য্যোধন চরমুখে এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে

বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য দুষ্ট মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে সমাগত ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদবযোদ্ধা কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্যে পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে ইহা অবগত করাইলেন। পরে সহাস্যবদনে প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের সেই অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, পাপাত্মাগণ স্বার্থসাধনের জন্য সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেমন বালকগণ বস্ত্র দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণে উদ্যত হয়, সেইরূপ ঐ সকল মূঢ়ব্যক্তি একত্র মিলিত এবং কামক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়াছে।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর সাত্যকির বাক্যশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কালপ্রেরিত হইয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিতে অভিলাষ করিতেছে। যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদিগের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের সকলকেই যুদ্ধকালে শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু পুরুষোত্তম বাসুদেব কদাপি নিন্দিত কর্ম্ম করিবেন না, ও ধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

বিদুরের বাক্যাবসানে মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রাজন্! শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করি-

বেন; কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করুক।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বিদুরও তিরস্কারছলে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল ফলিল না। তখন বাসুদেব সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্তধারণ পূর্ব্বক কুরুসভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণ-কুন্তী সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ভোজরাজনন্দিনী কুন্তী দেবকীতনয়ের মুখে কুরুসভামধ্যে সংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, কেশব! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জানাইবে যে, তোমার জননী তোমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়, আপদ্ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমার কর্ত্তব্য, এবং ভুজবীর্য্যই তোমার জীবিকা।

অতএব সাম, দান, ভেদ, দণ্ডাদি নীতি দ্বারা অপহৃত পৈতৃক অংশ পুনরায় উদ্ধার কর। আমি তোমাকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরপিণ্ডপ্রত্যাশী হইয়া রহিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ কর; পিতামহগণের নাম লোপ করিও না, এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নিরয়গামী হইও না।

হে মাধব! তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোদ্যোগী বৃকোদরকে আমার এই কথা জানাইবে যে, ক্ষত্রিয় পত্নীরা যে নিমিত্ত সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় সমাগত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রীধর্ম্মিণী ধর্ম্মানুগামিনী দ্রৌপদী নাথবতী হইয়াও যে কুরু-সভামাঝে অনাথার ন্যায় হইয়াছিলেন, একথা যেন সর্ব্বদা তাহাদের স্মরণপথে উদিত থাকে।

অনন্তর মহাবাহু হৃষীকেশ কুন্তীকে অভিবাদন করিয়া পাণ্ডবের তৎকালীন অবস্থিতি-স্থান উপপ্লব্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বভূতে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ এই বিপুল নরহত্যা রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবন মানসে যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ।

মহাবীর কর্ণকেই আপনার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ভাবিয়া দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে সাহসী হইয়াছেন। ফলতঃ সেই মহাসমরে কর্ণই অর্জ্জুনের সমকক্ষ মহারথী। যদি কর্ণকে কোনরূপে কৌরব পক্ষ হইতে বিচ্যুত

করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্ভবত এই সমরোদ্যোগের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ কর্ণ যে পাণ্ডবজননী কুন্তীর কানীন পুত্র তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। সুতরাং সেই সকল বিষয় কর্ণকে অবগত করাইয়া যদি এই ভবিষ্যৎ শোণিতস্রোত বন্ধ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য বাসুদেব আর একবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি রথারূঢ় কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, রাধেয়! তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ, এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার কানীন ও সহোঢ় পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র; পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃকুলজাত ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত; তুমি এই উভয়কুল অবগত হইয়া অদ্য আমার সহিত আগমন কর। পাণ্ডবগণও তোমাকে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন। তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইয়া সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী থাকিবে। তুমি নক্ষত্ররাজি-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশাসন ও কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন কর।

কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের এই হিতকর বাক্যের উপযোগিতা স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন, হে কৃষ্ণ! ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতমাত্রই জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর রাধা ও অধিরথ কর্ত্তৃকই আমি পুত্র-

নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়াই সূত জাতির সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ ও পুত্র পৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি কি প্রকারে তাহাদের পিণ্ডলোপ করিব? বিশেষতঃ দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া আমি ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছি, রাজা দুর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছি। এক্ষণে ভয় বা লোভবশতঃ তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিব না। আর আমার জন্মবৃত্তান্ত যে যুধিষ্ঠিরের অপরিজ্ঞাত আছে, তাহাও আমি হিতকর বলিয়া মনে করি। কারণ, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে, রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। তখন আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকেই তাহা প্রদান করিব। আপনি যখন পাণ্ডবদিগের নেতা হইয়াছেন, তখন তাহারাই জয়লাভ করিবে, অতএব যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন। আপনি আর আমাকে এইরূপ অন্য কোন মন্ত্রণা প্রদান করিয়া অর্থলোলুপ কৃতঘ্ন বা কাপুরুষ হইতে বলিবেন না। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

কর্ণ কোন মতেই সম্মত হইলেন না দেখিয়া বাসুদেব কহিলেন, হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা উপস্থিত

হইয়াছে, হায়! প্রাণীগণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইলে কিছুতেই তাহা প্রতিহত হয় না।

কর্ণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হয় আমরা এই ক্ষত্রাকুলান্তকারী মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, না হয়, দেহত্যাগে স্বর্গলাভ করিয়া সেখানে আপনার সহিত মিলিত হইব।

এই বলিয়া কর্ণ কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া বিষণ্নচিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণও সাত্যকি সমভিব্যাহারে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।



সপ্তদশ অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম।

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া হস্তিনাপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সকলে তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই মহাসমরে কাহার উপর সেনাপতিত্ব-ভার সমর্পিত হইবে, সেই বিষয়ে আন্দোলন হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! বাসুদেবই আমাদের বলাবল; ইনি কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, ইনিই আমাদিগের জয় পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব ইনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সকলের মতামত শ্রবণ করিয়া মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি পদের যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যথানিয়মে সেনাপতি পদে বরিত হইবার পর যথাস্থানে পাণ্ডবদিগের সেনানিবেশ সংস্থাপিত হইল।

এদিকে রাজা দুর্য্যোধন কুরুপিতামহ ভীষ্মকেই আপনাদিগের অধিনায়ক করিয়া সেনা পরিচালন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত যুদ্ধাভিলাষে ধর্ম্মতীর্থ কুরুক্ষেত্রে

সমবেত হইল। কৃষ্ণার্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া উভয় সেনার মধ্যস্থলে আসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভগবদ্গীতা।

ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় ও মিত্রদিগকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া এবং যুদ্ধের পরিণাম স্মরণ করিয়া বিষাদভরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কুলক্ষয়কারী সর্ব্বধ্বংশী যুদ্ধে অগ্রসর হইতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। তখন পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের উদ্দেশে এই অনুপম পবিত্র ধর্ম্মকথায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কথিত সেই অমূল্য উপদেশ সমষ্টিই সর্ব্বজনপূজ্য **ভগবদ্গীতা।** এই ভগবদ্গীতা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নানারূপে নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক! স্বতন্ত্র ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, এবং তাহাতেই তাঁহার পূর্ণাবতারের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। অর্জ্জুনও যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই গুহ্যতম জ্ঞানলাভ করিয়া মোহান্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের যুদ্ধ।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রের সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জ্জুন ভিন্ন কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু অর্জ্জুনও তাঁহার

প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি যথাশক্তি অস্ত্র নিক্ষেপে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। যিনি পিতৃহীন অবস্থায় পাণ্ডবদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মের দেহ কিরূপে অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিবেন, তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। কাজেই ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন সততই হীনপ্রভাব হইয়া পড়িতে লাগিলেন, সুতরাং পাণ্ডবগণের অসংখ্যসেনা ভীষ্মহস্তে নিহত হইতে লাগিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত না করিলে পাণ্ডব পক্ষ ক্রমশই হীনবল হইয়া পড়িবে দেখিয়া, এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতাপ সহ্যকরণে যেন অসমর্থ দেখিয়াই স্বয়ং ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য চক্রহস্তে অর্জ্জুনের রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক তাহাকে অনুনয় করিয়া এবং এবার হইতে নিজে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।

ধনঞ্জয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রথম আরম্ভাবধি দশদিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর ভীষ্মের কলেবর অর্জ্জুনক্ষিপ্ত শর নিকরে এরূপ বিদ্ধ হইল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট রহিল না। এইরূপ ক্ষতবিক্ষত কলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে পূর্ব্বশিরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ান হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দ্রোণপর্ব্বে কৃষ্ণলীলা।

ভগদত্ত বধ।

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য কৌরবদিগের সেনাপতি হইলেন। তাঁহার সেনাপতিত্ব সময়ে একদিন মহাবীর ভগদত্তের বিক্রমে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, সব্যসাচী অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের সময় ভগদত্ত অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া তাহার শেষ-শিক্ষা বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় সেই অস্ত্রের প্রবল প্রতাপ প্রতিহত করিতে পারিলেন না। তখন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজ নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনকে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে অর্জ্জুনও সুতীক্ষ্ণ শরজালে হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন ভগদত্তকে ভূমিতলে নিপাতিত ও নিহত করিয়া বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিলেন।

জয়দ্রথবধ।

একদিন অর্জ্জুন নারায়ণী সেনাসহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে কৌরবগণ সপ্তরথী মিলিয়া অর্জ্জুনপুত্র যোড়শবর্ষীয় অভিমন্যুকে অন্যায়রূপে সমরক্ষেত্রে নিহত করিলেন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর সন্ধ্যার সময় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে অর্জ্জুন পুত্রনিধন বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। সকলেই শোককাতর হইয়া পড়িলেন, অর্জ্জুনের সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল, তাঁহার প্রাণের ভিতর দাবানল হু হু শব্দে জ্বলিতে লাগিল। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানকরতঃ বলিলেন, হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইও না; যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি শোক করিও না।

পুত্রশোকার্ত্ত অর্জ্জুন বাসুদেবের প্রবোধবাক্যে কতক ধৈর্য্যধারণ করিলেন বটে; কিন্তু যখন শুনিলেন, জয়দ্রথ তাহার পুত্রের মৃত্যুর প্রধান কারণ, তখন নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া কঠিন শপথ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্য্য অস্ত গমনের পূর্ব্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন; যদি তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং প্রজ্জলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

ধনঞ্জয়ের এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় পাণ্ডবশিবিরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সেনানীগণ উৎসাহে উঠিয়া বসিল, বাদিত্রগণ বাজনা বাজাইয়া যুদ্ধের সূচনা দেখাইল, সকলেই বীরনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথামত পুত্র-শোকাকুলা স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে সান্ত্বনা করিতে যাইলেন। তিনি অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, সুভদ্রে! সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অতএব শোক করিবার আবশ্যকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রুসংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞাদ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে। শস্ত্রজীবিগণ যেরূপ গতিলাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর।

মহাবাহু বাসুদেব সুভদ্রা, দ্রৌপদী, উত্তরা প্রভৃতি শোকাকুলা রমণীবৃন্দকে প্রবোধ দান পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ক্রোধান্ধ হইয়া যেরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদিত

হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। রাজা জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর দেশের অধিপতি, বহুসেনার অধিনায়ক এবং দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবগণের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাগণ প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা সাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, অর্জ্জুন নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, পাণ্ডবদিগের জয়পরাজয় অর্জ্জুনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অথচ পাণ্ডবেরা এক্ষণে শোকবিহ্বল হইয়া মন্ত্রণায় বিমুখ রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৌরবশিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন এবং জানিলেন, কৌরবেরা অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথ রক্ষার্থ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, দ্রোণাচার্য্য ব্যূহরচনা করিবেন, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্যাদি কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ সমবেত হইয়া জয়দ্রথকে প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া সমস্ত বীরগণকে এককালে পরাজয় পূর্ব্বক মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করা অর্জ্জুনেরও সাধ্যাতীত হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অর্জ্জুন নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

অতএব কি করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুদক্ষ সারথি দারুককে নিজের জন্য বেগশালী অশ্বযোজিত ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিপূরিত রথ প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। ভাবিলেন, যদি একান্তই অর্জ্জুন কল্য ব্যূহদ্বার ভেদ করিয়া একদিনে সমস্ত বীরগণকে পরাজয় সাধন পূর্ব্বক জয়দ্রথ বধে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সখার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বয়ংই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়দ্রথ বধের পথ

প্রশস্ত করিয়া দিবেন। এইরূপ চিন্তা ও উদ্যোগে সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যুদ্ধবিদ্যায় চরম উৎকর্ষ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বীর্য্যপ্রভাবে অস্ত্রশিক্ষাকৌশলে দ্রোণব্যূহ ভেদ করিয়া কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রুতায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের প্রতাপে শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু কেহই অমিতপরাক্রম ধনঞ্জয়ের রোষপ্রক্ষিপ্ত শরজালের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। অর্জ্জুন সমস্ত ভেদ করিয়া রণস্থলে জয়দ্রথ সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণভাগে, সূতপুত্র কর্ণ বামভাগে সোমদত্ত প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠপ্রদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃপ, বৃষসেন, শল্যাদি বীরগণ সহ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। তখন সব্যসাচী অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। কিন্তু সেই সময় অর্জ্জুনের রুদ্রমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কৌরবগণ জয়দ্রথকে সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, জয়দ্রথকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে বারম্বার লুক্কায়িত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধা দ্বারা অর্জ্জুনের পথ রোধ করিলে ইতিমধ্যে তাঁহার বধসাধন অর্জ্জুনের অসাধ্য হইয়া উঠিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে গর্ব্বমদে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। অহঙ্কার রূপ অন্ধকার প্রভাবে তাঁহাদের জ্ঞান-সূর্য্য অস্তগতপ্রায় হইলে জয়দ্রথ

ভাবিল যে, এত বীর আমার পৃষ্ঠপোষক থাকিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্জ্জুন আমাকে কি নিধন করিতে পারিবে? তবে কেন বৃথা পলায়িত কাপুরুষের ন্যায় লুক্কায়িত থাকি; এই ভাবিয়া বলদৃপ্ত জয়দ্রথ সমর-প্রাঙ্গণে অর্জ্জুন সমীপে আসিয়া দেখা দিল। ইহাই ভারতে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি ও সূর্য্যাবরণ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, অবশেষে জয়দ্রথকে বীরগণসহ গর্ব্বভরে সম্মুখে বীরমূর্ত্তিতে সমাগত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্ত ধনঞ্জয় অসংখ্য শর-নিপাতে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেনাদিকে এরূপ ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া বিপক্ষের প্রতি শরসন্ধানের সুযোগ পাইতে না পাইতেই শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতক্রমে অর্জ্জুন অকস্মাৎ সুতীক্ষ্ণ শরক্ষেপণ পূর্ব্বক জয়দ্রথের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণেরও কার্য্যক্ষেত্র কতক অগ্রসর হইয়া আসিল।

দ্রোণবধ।

শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্যের সমর নৈপুণ্যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আর বড় অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র উভয়পক্ষেরই সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণাচার্য্যকে ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্ব-কথায় এরূপ প্রণোদিত করিয়া তুলিলেন যে, বৃদ্ধ আচার্য্য অধর্ম্মাচরণে সহায়তা দ্বারা স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামার অমঙ্গল সংঘটন করাইবার জন্যই যেন তিনি যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন, এরূপভাব তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া গেল। কোন গর্হিতকার্য্যে

প্রবৃত্ত হইতেছি, এ ভাব পাষণ্ডের মনে উদয় হইলেও তাহার অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি উপস্থিত স্থলে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত কাপুরুষত্ব প্রকাশ ও দুর্য্যোধনের মনে দারুণ আঘাত করিয়া কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া যোগ-সমাধিতে আত্মবিসর্জ্জনে মনস্থ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের এইরূপ যোগসাধনার সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃ-শত্রুতা স্মরণ করিয়া পাণ্ডবগণের সেনাপতিত্ব দেখাইবার জন্যই যেন তরবারি ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের নিকট বারম্বার পরাজিত হইয়াছিলেন, কোন বারে সাত্যকি, কোন বারে ভীম, কোন বারে বা অর্জ্জুন আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এবার দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ছিল না, উৎসাহ না থাকিলেই শ্রান্তির অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সুদুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া আত্মাহীন শবদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া কৌরবগণ সমক্ষে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিলেন।



ঊনবিংশ অধ্যায়।

কর্ণ পৰ্ব্ব।

দ্রোণের পর মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন। কর্ণই অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা ছিলেন। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, কর্ণ, দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জ্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু, কর্ণেরও তেমনি বিজয়ধনু ছিল। উভয়েই নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে সুশিক্ষিত ছিলেন। আবার একদিকে যেমন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনি অপর দিকে মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথিরূপে সমাগত হইলেন।

বাসুদেব, অর্জ্জুনকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, সখে! এক্ষণে তোমাকে যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজ-শল্য-সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণকরতঃ সমাগত হইতেছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণসহ ইতস্ততঃ

ধাবমান হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্র কর্ণকে নিপীড়িত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ লইয়া কর্ণের সমক্ষে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি ভীষণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে শোণিতধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই শর নিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করতঃ সংগ্রামস্থলে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বলবীর্য্য পৌরুষ ও অস্ত্রশিক্ষার প্রভাবে কখন সূতপুত্র কখন ধনঞ্জয় অধিকতর প্রতাপশালী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তখন পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিসহ ঘোরসংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কেহ-বা কর্ণের কেহ বা অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সূতপুত্র কর্ণ ভীষণ দিব্যাস্ত্রের অবতারণা করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত দিব্য শর অন্তরীক্ষে প্রজ্জলিত দেখিয়া সত্বরে পদাঘাত দ্বারা অর্জ্জুনের রথ ভূতলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু আকুঞ্চিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের মস্তক পরিত্রাণ পাইল, কিন্তু তাহার দিব্য কিরীট অস্ত্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণনিক্ষিপ্ত শর-জালে নিপীড়িত দেখিয়া উৎসাহবাক্যে বলিলেন, হে অর্জ্জুন!

এই সময় তোমার দিব্যাশিক্ষা প্রকাশ কর, যমদণ্ড সদৃশ শরনিকরে কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ কর। আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। নিজের শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া কর্ণের বিনাশ সাধনে যত্নবান হও।

শত্রুতাপন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতান্ত-সদৃশ ভয়ঙ্কর অস্ত্র সমুদায় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সূতপুত্রের রথচক্র মাটিতে দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল। মহাবীর কর্ণ তাহা দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং যতক্ষণ তাহাতে কৃতকার্য্য না হন, ততক্ষণ অর্জ্জুনের নিকট যুদ্ধবিরাম প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মবীর অর্জ্জুন কর্ণের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া কৌরবগণের অত্যাচার ও অধর্ম্মপরায়ণতার বিষয় অর্জ্জুন সমীপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সূতপুত্রসহ মন্ত্রণাকারী কৌরব-গণের অধর্ম্মাচরণ স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠি-লেন, তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল।

এদিকে সূতনন্দন ইত্যবসরে রথোপরি আরোহণ করিলে পুনরায় শরজাল বিনিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এবার অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সূতপুত্রের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তখন কর্ণের বিজয়াশা তাহার মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহার দেহ শিথিল হইয়া পড়িল, তাঁহার উৎসাহ লোপ

পাইল। এমন সময় পার্থ মহাবীর কর্ণের বিনাশবাসনায় বজ্র-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ অঞ্জলিকবাণ তূণীর হইতে গ্রহণপূর্ব্বক শরাসনে সংযোজিত করিলেন, এবং গুরুপদ ধ্যান করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর বেগে কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত তেজোময় শায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সূতপুত্রের মস্তকোপরি সবেগে পতিত হইল। গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় কর্ণ ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া গেল। বাসুদেবের কৃপায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণবধ প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।



বিংশ অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র সমরের অবসান।

দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ।

কর্ণ নিহত হইলে পর শল্য সেনাপতিপদে বরিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহার কাপুরুষত্ব-কলঙ্ক দূর করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যুধিষ্ঠির সাহসে ভর করিয়া প্রাণপণে শল্যের সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কৌরবগণের সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে মাত্র জীবিত দেখিয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বৈপায়ন হ্রদস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে পলায়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। একজনের উপর একাধিক ব্যক্তির আক্রমণ কর্ত্তব্য নহে বলিয়া একজনের সহিতই দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ স্থিরীকৃত হইল। পাণ্ডবপক্ষে ভীম ব্যতিরেকে আর কেহই দুর্য্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে সমকক্ষ নহে; সুতরাং বাসুদেবের পরামর্শ মতে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধন মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,

তাহার যুদ্ধনৈপুণ্য ভীমের অপেক্ষা বড় কম ছিল না, বিশেষতঃ তিনি আজ 'মরিয়া' ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, স্নুতরাং সে বেগ সহ্য করিতে ভীমকেও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতে হইল। কিন্তু অবশেষে দুর্য্যোধন ভীমের ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; তাঁহার জীবনের আশা লোপ পাইল। বাসুদেব এরূপ কাতর অবস্থাপন্ন শক্রকে নিগ্রহ করিতে নিবারণ করিলেন। যুদ্ধ স্থগিত হইল।

অনন্তর অশ্বত্থামা, পিতৃবধ বৈরনির্য্যাতন মানসে নিশীথ সময়ে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া পাণ্ডব-শিবিরে উপস্থিত হন, এবং সেখানে অতর্কিত ও নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিয়া বৈরনির্য্যাতন বাসনা পরিতৃপ্ত করেন। পরে তথা হইতে রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতন-প্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন, এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহারা সেখানে অশ্বত্থামাকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মৃতকল্প রাজা দুর্য্যোধনের দেহ একবার বিকম্পিত হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত লোকে গমন করিল।

এদিকে অন্য শিবিরে অবস্থিত পাণ্ডবগণ পরদিন প্রাতে নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রাদির হত্যা বৃত্তান্ত অবগত হইলে ক্রোধোন্মত্ত ভীমসেন অশ্বত্থামার বিনাশসাধন জন্য ধাবমান হইলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া ভীম-

সেনের অনুগমন করিলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণার্থ গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুনও তাহা নিবারণের নিমিত্ত গুরূপদিষ্ট ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশির বাণের অবতারণা করিলেন। তখন বাসুদেব বৃথা আর গুরুপুত্র হত্যার প্রয়োজন নাই বুঝাইয়া উভয়কে অস্ত্র সম্বরণ করিতে আদেশ করিয়া অশ্বত্থামার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার মস্তকমণি ছেদন করিয়া লইলেন।

এই সময় নিশীথ হত্যার ভয়ঙ্কর বার্ত্তায় অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার অন্তরে হঠাৎ যেমন এক বিকট চিন্তার উদয় হইল, তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সেই সময় উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন, তাঁহার গর্ভপাতের লক্ষণ দেখা দিল। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ চিকিৎসা তন্ত্রে গর্ভরক্ষানুযায়ী পন্থাবলম্বনে এই আকস্মিক গর্ভপাত রক্ষা করিলেন।

এইরূপে কুরুক্ষেত্র সমরের অবসান হইলে শোকাকুলা গান্ধারী ও কৌরব রমণী কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমিতে আসিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদিগকে প্রবোধ দান জন্য বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা মত স্বয়ং পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী সমীপে গমন পূর্ব্বক যথাবিহিত সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রশোক শেলবিদ্ধ হৃদয়ে কোন সান্ত্বনাই স্থান পাইল না, বরং শ্রীকৃষ্ণকেই কৌরবগণের পরাজয়ের কারণস্বরূপ ভাবিয়া দুর্য্যোধন জননী গান্ধারী তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমারও গৃহে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া তোমাদেরও বংশ ধ্বংশ হইবে, তোমারও কুলরমণীগণ এই-

র্বংশ পুত্রহীন বন্ধুবান্ধবহীন, আত্মীয়স্বজনবিহীন হইয়া বিলাপ ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

কৃষ্ণ সহাস্যবদনে গান্ধারীর শাপ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, দেবি। আপনার অভিশাপ পূর্ণ হইবে, ইহা আমি অগ্রে অনুধাবন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি শোকবেগ সংবরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করুন। এই বলিয়া বাসুদেব গান্ধারীকে নানারূপ বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।



একবিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন।

...নায়ণ অত্যাচারীদিগের বিনাশ সাধন ব্যাপার সমাহিত হইলে বাসুদেব ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন। অনন্তর তাঁহাকে রাজধর্ম্ম শিখিবার জন্য সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মের নিকট গমন করিতে বলিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। বাসুদেব তথায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্ম প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভার গ্রহণ করিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন; কুরুপিতামহ! আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্ম-

তত্ব শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন সকলে আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পর ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত থাকিয়াও যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে ভীষ্ম যোগাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শবদেহ পড়িয়া রহিল। তখন ধৃতরাষ্ট্রাদি কৌরবগণ ভাগীরথী তীরে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শোকাকুলিত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কামগীতা।

মহামতি ভীষ্মের দেহত্যাগের পর যুধিষ্ঠির এহেন জ্ঞাতি-বধ পাপাকীর্ণ রাজ্যভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বনগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নূতন ব্যাধি সঞ্জাত হইতেছে দেখিয়া তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বলিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ। ইহা আপনি এখনও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আপনার

এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় রিপু বাস করিতেছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? অহঙ্কারই, জীবাত্মাকে মোহে অভিভূত করিয়া ফেলে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অহঙ্কার বিনাশের উপায় নাই। হে মহারাজ! সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আত্মাভিমানের মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া দেখা দেয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শরীরের গুণ; যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটী গুণ আছে। ঐ তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহারও দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে

সুখ দুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখ দুঃখাতীত পরব্রহ্মকেই স্মরণ করাই আপনার বিধেয়।”

“ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয় পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।”

“হে ধর্ম্মবীর! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয় ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোক সমুদয়ের চিত্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের

অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসা-পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গম সংবলিত সমুদায় জগত লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসার-পাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফল মূলাদি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসার-জালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কাম-পরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামস্পৃহা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফল লাভের বাসনা-সহকার দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এক-কালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।”

“ধর্ম্মরাজ! নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা কামনাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, কামনা তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কামনাকে পরাজিত

করিতে চেষ্টা করে, কামনা তাহার মনে জঙ্গম মধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হয়। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা কামনাকে শাসন করিতে যত্নবান হয়,—কামনা তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা কামনাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, কামনা কখনই তাহার মন হইতে অপসৃত হয় না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা কামনাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, কামনা তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হয়, এবং যে ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য কামনাকে জয় করিতে বাসনা করে, কামনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কামনাকে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।”

হে ধর্ম্মরাজ! আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তারে কীর্ত্তন করা হইল। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বন্ধুবিয়োগে বারম্বার অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলে ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দ্বারকা প্রত্যাগমনের জন্য অভিলাষ প্রদর্শন করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, বাসুদেব! আপনি পিতৃদর্শনের অভিলাষী হইয়াছেন,

সুতরাং এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন করুন। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। আপনি দ্বারকায় গমন করিয়া উঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক উঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবেন, আপনাকে অধিক আর কি বলিব, আমাদিগকে আপনি যেন বিস্মৃত না হন; ইহাই আমার প্রার্থনা। আর একটি বিশেষ অনুরোধ যে, যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই আপনাকে আগমন করিতে হইবে। আপনার প্রভাবেই আমরা রাজ্যলাভ করিয়াছি, এবং আপনার সহায়েই অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমাপনের অভিলাষ করিয়াছি। আপনার সহবাস সততই আমাদের প্রার্থনীয়।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব পিতৃস্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতির অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন।



দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের শেষ লীলা।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য জগতে প্রচার করিয়া মহামতি বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক লইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে আগমন করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক পিতামাতার চরণ বন্দনা করিলেন।

অনন্তর কেশব বিশ্রামলাভ পূর্ব্বক যথাসুখে উপবিষ্ট হইলে বসুদেব তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রের সমর-সংবাদ বর্ণন করিতে বলিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় যুদ্ধবিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্র অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন, তজ্জন্য অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যু-জননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রের নিধন বৃত্তান্ত কথিত হইল না দেখিয়া পিতার নিকট তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক শোকভরে তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বসুদেবও কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পিতা, ভগিনীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদের শোকানল নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বসুদেব শোক সংবরণ পূর্ব্বক দৌহিত্রের উদ্দেশে যথাবিহিত শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

হস্তিনানগরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসের নির্দ্দেশমত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবও যথাসময়ে আহূত হইয়া যজ্ঞের সাহায্য এবং উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়-কামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শম্বনদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! আমি আপনার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। আপনিই স্বীয় পরাক্রমে ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব আপনিই স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হউন, আপনি আমাদিগের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! আপনি নিতান্ত সত্ত্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবে

কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগের রাজা। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে। অতএব এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহাতে আমাকে নিয়োগ করুন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক যজ্ঞের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইল। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় আহৃত হইতে লাগিল।

পরীক্ষিতের জন্মবিবরণ।

বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামীশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গর্ভস্থিত শিশুর বিঘ্ন ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ঘটিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে বাসুদেব হস্তিনায় সমাগত হইলে পর একদিন উত্তরার প্রসব-ব্যথা উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তরার গর্ভ হইতে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অন্তঃপুরস্থ রমণীবৃন্দ উত্তরার পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেই পুত্রকে মৃতবৎ দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে যুযুৎসুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহা-বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিতে বারম্বার

অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বর গমনে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি আমাদের একমাত্র গতি। তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র গত-জীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমরা এই শিশুর আশাতেই প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই বালকই আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। যে কোনরূপে এই বালকের জীবন দান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর। এই বলিয়া কুন্তী হাহাকার রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর গমনে অভিমন্যু তনয়ের জন্মভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে দ্রৌপদী সত্বরে বিরাটতনয়া উত্তরার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, বৎস! এই দেখ, তোমার শ্বশুর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন, আর ভয়ের কোন কারণ নাই। যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পাকুললোচনা বিরাটনন্দিনী বস্ত্রাবৃত হইয়া সঙ্কুচিতভাবে উপবিষ্ট হইলেন।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণও শ্বাস-প্রশ্বাস বদ্ধ মৃতবৎ শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চিকিৎসা-জ্ঞানলব্ধ প্রক্রিয়া-বলে রুদ্ধ শ্বাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিশ্বাস ক্রিয়া সঞ্চালন করাইতে লাগিলেন। কিয়ৎসময় মধ্যেই শিশুর সজীবত্ব দেখা দিল। নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মৃতবৎ শিশু পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল।

জলনিমগ্ন ব্যক্তি অকস্মাৎ নৌকাপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও কৌরবপত্নীগণ সেইরূপ মহা আহ্লাদিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উত্তরা শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মহোল্লাসে ভক্তিভরে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণ নবজাত শিশুকে মহামূল্য বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় যখন এই পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন ইহা পরীক্ষিত নামে অভিহিত হউক। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পরীক্ষিত প্রাণলাভ করিয়া শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই আনন্দ-পারাবারে ভাসমান হইলেন।



ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যদুকুলধ্বংস।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিসমাপ্তির পর বাসুদেব দ্বারকানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্রপৌত্র কলত্রাদিসহ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতাপে কোথাও আর কোন প্রকার আপদের আশঙ্কা রহিল না। নিরুদ্বেগে সুখের ক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া যদুবংশীয়গণ ক্রমশঃ ভোগ-পরায়ণ হইয়া পড়িলেন। ভোগবাসনা হইতে ক্রমশঃ অসৎ প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিতে লাগিল। তখন তাঁহারা মনের কৃত্রিম স্ফূর্ত্তিবিধানের জন্য সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ এরূপ সুরাপায়ী হইয়া পড়িলেন যে, বলদেব বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে নগর মধ্যে ঘোষণা প্রচার করাইলেন যে, অদ্য হইতে কোন ব্যক্তি এই নগর মধ্যে সুরা বিক্রয় করিতে পারিবে না, যে কেহ গোপনভাবে এই সুরা প্রস্তুত করিয়া এই আদেশ অবহেলা করিবে, তাহাকে সবান্ধবে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতে হইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে নগরবাসী লোক সমুদায় রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সুরা বিক্রয়করণ হইতে এককালে বিরত রহিল।

এদিকে কিন্তু যদুবংশীয়দিগের অসৎপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা ঘোরতর দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগের সকলকে প্রভাসতীর্থ গমনের জন্য আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র পরিবারাদির সহিত পান-ভোজনে উন্মত্ত হইতে লাগিল। যদুবংশীয়গণ নিজেরাই রাজাজ্ঞা অমান্য পূর্ব্বক ঘরে ঘরে সুরার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমশঃ এতদূর তাহার বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, গুরু-জন সমক্ষেও সুরাপানে তাহাদের লজ্জা বোধ হইত না। সুরা রাক্ষসীর সহিত ব্যভিচারও ক্রমশঃ দেখা দিল। তখন প্রভাস-তীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্তব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং উন্মত্ত বাদ্য-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমস্ত দিবাযামিনী কেবল সুরা স্রোত চলিতে লাগিল,—সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আর কেহ কাহাকেও মানিতেন না, পরস্পর পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এহেন ঘোরতর অবস্থায় সকলেই সুরাস্রোতে ভাসমান হইতেছে দেখিয়া এবং কালচক্রে যদুকুলধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া বাসুদেব ইহলোক পরিত্যাগের জন্য বাসনা করিলেন।

এদিকে যাদবগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই

সুরাদেবীর উপাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অথচ সময়ে সুরাপানের বিষময় ফল দেখা দিল। যদুবংশীয় সকলেরই উদরে ভয়ঙ্কর প্লীহা-যকৃৎ রূপ সাংঘাতিক মুষলের সৃষ্টি হইল। সেই মুষলের প্রভাবেই যাদবগণ একে একে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল। বাসুদেব এই মুষলের প্রতি-বিধানে যত্ন করিলে যদুবংশীয়গণ ক্রমশঃ আরও অধিকতর দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, এবং জগতের অহিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ভাবিয়া, তিনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত রহিলেন। সুতরাং দেখিতে দেখিতে যাদবকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।



চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

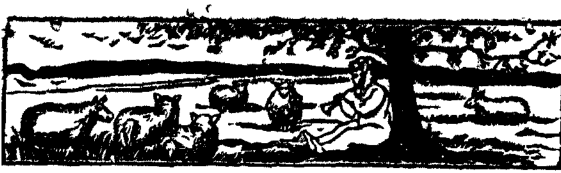
মহামতি বলভদ্র যাদবকুলের এই সমস্ত শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া এবং বাসুদেবকে তাহার প্রতিবিধানে উদাসীন দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যদুকুল ধ্বংসের আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি কোন নির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যোগাবলম্বনেই দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সংসার-লীলা সমাপন করিয়া জড়দেহ পরিত্যাগে বাসনা করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা মহাসমাধিতে অবস্থিত হইলেন। তিনি মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া মানবদেহের সমস্ত ধর্ম্ম দেখাইবার জন্যই যেন জরাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। এই জরাব্যাধিই হয়ত শাস্ত্রে 'জরাব্যাধ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, অবশেষে যোগাসনে শয়ান অবস্থায় মহা-পুরুষের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনির্গত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহা অনন্ত ভূতে বিলীন হইয়া গেল, অমনি সেই পরিত্যক্ত দেহ কেমন-এক কালিমাবর্ণে আবৃত হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ 'মানব-লীলা' পরিহার পূর্ব্বক অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত ধামে বিরাজমান হইলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক কর্তৃক সংবাদ পাইয়া অর্জ্জুন প্রভাসক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন করিলেন। যিনি সংসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবার জন্য—সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার মানবদেহ এইরূপে সংসার হইতে মানব চক্ষুর অগোচর হইয়া গেল। তাঁহার প্রেমময় কলেবর এইরূপে জগত-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু অনন্ত মানবহৃদয় এখনও সেই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পাঠক! আইস, আমরাও হৃদমন্দিরে সেই পূর্ণাবতারের আবির্ভাব দেখিয়া সংসারের ঘোরতর আবর্ত্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করি।



পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পাঠক! এক্ষণে হয়ত আপনাদের মনে উদিত হইতে পারে যে, যাঁহার জন্ম, শৈশবশিক্ষা, বালক্রীড়া, যৌবনসম্ভোগ, জয় পরাজয়, জরামরণ সমস্তই মানবশক্তির অন্তর্ভূত, সেই মনুষ্যদেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিব? যিনি সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মাণ্ডবিধাতা জগদীশ্বর তাঁহার এই ক্ষুদ্র মানব-মূর্ত্তিতে অবতারণা কেন, মানব জীবনের সুখ দুঃখ ভোগ করিবার প্রয়াস কেন? যদিই বা ইচ্ছাময়ের মানব-মূর্ত্তি ধারণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাঁহার ঐশী-শক্তির বিকাশ না দেখিলে তাঁহার অষ্টৈশ্বর্য্যের প্রমাণ প্রত্যক্ষ না করিলে কিরূপে অবতার-বাদে বিশ্বাস জন্মিবে?

পাঠক! এইখানেই অবতার তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। যিনি অনন্ত শক্তিমান ইচ্ছাময় পরমেশ্বর, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে, অকিঞ্চিৎকর জরাসন্ধ শিশুপাল বধের জন্য

নগণ্য অসুর বিনাশের নিমিত্ত—মনুষ্যোচিত অতি সামান্য বিষয় আয়ত্বাধীন করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? তাঁহার ইচ্ছায় ক্ষণমাত্রেই কোটি কোটি অসুরের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইতে পারে, নিমেষ মধ্যেই অসংখ্য অসংখ্য বৃন্দাবন, দ্বারকা, কুরুপাণ্ডবের উৎপত্তি লয় ঘটিতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব জগতের শ্রেষ্ঠজীব হইলেও ভগবানের সেই অনন্তলীলা ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনুধাবন করিতে পারে না। যাহা মানবের চিন্তার অতীত, মনুষ্যের কল্পনার সীমা হইতেও যাহা বহুদূরে অবস্থিত, মানবসমক্ষে সেই অচিন্ত্য অগম্য বিষয়ের অবতারণা করিলে মানুষ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে পারেন, এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে অবনত মস্তকে অনন্তশক্তিমানের অনন্তলীলা বলিয়া অনন্তত্বের সহিত মিশাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে জগতে এই মানবলীলার কার্য্যভূমিতে তাহার অনুকরণ সংঘটিত হইতে পারে না।

অতএব জগতে যদি মানব-সমাজের উন্নতিকল্পের প্রয়োজন থাকে, এবং সেই জন্য লীলাময় ভগবান যদি মানবলীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবানের সেই মানবলীলা—সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার মনুষ্যাবতার—তাঁহারই সৃষ্ট মানববুদ্ধির অধিগম্য ও মানব চেষ্টার আয়ত্তিভূত কার্য্যকলাপেই পর্য্যবসিত থাকা আবশ্যক। নতুবা যাহাদের জন্য ভগবানের আবির্ভাব তাহারা কিরূপ স্বশক্তিতে তাঁহার কার্য্যের অনুসরণে সমর্থ হইবে? যাহাদিগের নিকট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাদের ক্ষমতা কোন কালেই যদ্যপি সেই শক্তির

অনুকরণে অন্ততঃ চেষ্টা করিতেও না পারে, তবে তাহাদিগের নিকট ভগবানের অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার আবশ্যক কি?

তাই বলি, লীলাময় ভগবান যদি জগতের হিতের জন্য মানব সমাজের মঙ্গলবিধান নিমিত্ত—মনুষ্য মূর্ত্তিতে মানবচক্ষের সম্মুখে দেখা দেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য-প্রণালী মানব শক্তির অতীত না হইয়া আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পাঠক! বৃথা কূট-কুটিল তর্কে আর প্রয়োজন নাই, আসুন, একণে সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের পূর্ণাবতার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিতে যত্নবান হই; তাঁহারই প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদ্‌পদ্মের রাসমণ্ডলে সংস্থাপিত করিয়া সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের বিহার-সম্ভোগ অনুভব করি, এবং তাঁহারই প্রেম-ভক্তিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহারই যুগলচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করি।

সম্পূর্ণ।